পাঠকপ্রিয় ইমাম সিরিজের
সপ্তম জীবনীগ্রন্থ

শাইখুল ইসলাম

ইবনু তাইমিয়া

(রাহিমাহুল্লাহ)

জীবন ও কর্ম

Boier Somahar
Click here
to join our Telegram Channel

সূচিপত্র

শুরুর আগে ১৩

সমকালীন প্রেক্ষাপট ১৬

রাজনৈতিক অবস্থা ১৭

সাম্রাজ্যের রীতিনীতি ১৯

সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা ২১

শিক্ষা ও জ্ঞান ২৫

জন্ম, বংশপরিচয় ও শৈশবকাল ২৯

জন্ম ২৯

পিতা ও পিতামহ ২৯

পিতামহের পরিচয় ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ৩০

দাদির পরিচয় ৩১

তাইমিয়া নামে প্রসিদ্ধির কারণ ৩১

দৈহিক গঠন ৩২

কয়েক টুকরো শৈশব ৩২

শৈশবে দ্রুত হিফজের পরীক্ষা ৩২

বিস্ময়কর স্মরণশক্তি ৩৩

কুরআনের বিনিময় না নেওয়ার প্রত্যয় ৩৪
ছোট্ট ইবনু তাইমিয়ার হাতে প্রতিবেশী ইহুদির ইসলামগ্রহণ ৩৫

শিক্ষা-দীক্ষা ৩৬
প্রাথমিক শিক্ষা ৩৬
উচ্চশিক্ষা ৩৬
জ্ঞান আহরণের অদম্য নেশা ৩৯
শাইখুল ইসলামের ইলমি শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ৪১
পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও সামগ্রিকতা ৪৩
শাইখুল ইসলামের উস্তায ৪৪
শাইখুল ইসলামের ছাত্র ৪৪

দাওয়াত ও অধ্যাপনা ৪৬
ফতোয়া প্রদানের আসনে শাইখুল ইসলাম ৪৬
ফতোয়া প্রত্যাশীদের সাথে বিনম্র আচরণ ৪৭
শাইখুল হাদিসের পদে শাইখুল ইসলাম ৪৭
শাইখুল ইসলামের দারস প্রদানের পদ্ধতি ৪৮
প্রথম তাফসির মজলিস ৪৯
যেমন ছিল শাইখের তাফসির মজলিস ৪৯
হাম্বলি মাদরাসায় দারস প্রদান ৫০
তারসিম কারাগারে তিন পাদরির বিতর্ক ৫১
শাইখুল ইসলামের উপস্থিত বুদ্ধি ৫২

ভেতর-বাহির ৫৪
পোশাক-পরিচ্ছদ ৫৪
চারিত্রিক গুণাবলি ৫৫
মানবিকতা ৫৫
বদান্যতা ও পরোপকারিতা ৫৬
বীরত্ব ও চিন্তার দৃঢ়তা ৫৮

নিষ্ঠা ও নিবিষ্টচিত্ততা	৬২
ধৈর্যশক্তি	৬৩
অন্যের প্রশংসায় তার প্রতিক্রিয়া	৬৩
সরকারি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি	৬৪
শাইখুল ইসলামের রাতদিন	**৬৫**
ইবাদত	৬৫
শাইখুল ইসলামের কাছে জিকিরের গুরুত্ব	৬৮
তাকওয়া	৬৯
দুনিয়াবিমুখতা	৬৯
সালাত ও দুআর পূর্বে	৭০
অভূতপূর্ব বিনয়	৭০
হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহর সাথে বিনয়	৭০
কারামত ও অন্তর্দৃষ্টি	৭১
অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা	৭৪
ইলমি সাহসিকতা	৭৫
সবচেয়ে বড় শত্রুর মৃত্যুসংবাদে শাইখের আচরণ	৭৬
জিনে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় শাইখুল ইসলাম	৭৬
জিহাদের ময়দানে শাইখুল ইসলাম	**৭৮**
জিহাদের ময়দানে	৭৮
শাইখুল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ	৭৮
তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধ ও ইবনু তাইমিয়ার ভূমিকা	৭৯
তাতারদের হাত থেকে সিরিয়াকে রক্ষায় শাইখুল ইসলামের ভূমিকা	৮০
দামেশকে জরুরি পরামর্শ সভা	৮১
তাতারিদের অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং ব্যাপক লুটপাট	৮৩
শাইখুল ইসলাম ও বুলাই খাঁ	৮৬
বুলাই খাঁর পলায়ন	৮৬

তাতারিদের পুনরাগমন এবং শাইখুল ইসলামের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৮৭
আবারও আতঙ্ক ৮৮
শাইখুল ইসলামের মিশর সফর ৮৯
নেমে এলো আল্লাহর গজব ৯০
শাকহাবের যুদ্ধ ও ইবনু তাইমিয়ার কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ৯১

শাইখুল ইসলামের সংস্কার আন্দোলন ৯৫
রাজনৈতিক সংস্কার ৯৬
অর্থনৈতিক সংস্কার ৯৭
সেনাবাহিনী সংস্কার ৯৭
ঈমান ও আকিদা সংস্কার ৯৮
নজর-নেওয়াজ মানার পাথর গুঁড়িয়ে দেওয়া ৯৮
পাথরের স্তম্ভ ভেঙে ফেলা ৯৯
কালো ফলক ভেঙে ফেলা ১০০
বরকত লাভের মূর্তি ভেঙে ফেলা ১০০
শিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান ১০১
সুফিদের বিরুদ্ধে শাইখুল ইসলামের তৎপরতা ১০১

শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তার কারাবরণ ১০৪
ক. কষ্ট ও যন্ত্রণার শিকার ১০৪
খ. ইবনু তাইমিয়ার বিরুদ্ধে আলিমদের অবস্থানের কারণ ও তার পর্যালোচনা ১০৫
গ. কারাবরণ ১০৭
ঘ. কাগজ-কলম ছিনিয়ে নেওয়া ১১৯
শাইখুল ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে শাওকানির মূল্যায়ন ১২০

কারাগারের দিনগুলো ১২২
ক. জিকির-আজকার ১২২
খ. অধ্যয়ন ১২৫
গ. লেখালেখি ১২৫

ঘ. দাওয়াতি কার্যক্রম, ফতোয়া প্রদান ও দারস-তাদরিস ১২৬

জীবন সায়াহ্নে ১২৮

মৃত্যু ১২৯

জানাযা ও দাফন ১৩০

শাইখুল ইসলামের পানাহার ১৩২

শাইখুল ইসলামের প্রশংসায় আলিমগণ ১৩৪

শাইখুল ইসলামের রচনা ও গবেষণা ১৩৭

তার রচনাবলির বৈশিষ্ট্য ১৪১

তার রচিত ও সংগৃহীত কিতাব থেকে মানুষের উপকার গ্রহণ ১৪৩

নির্বাচিত বাণী ১৪৫

Boier Somahar
Click here
to join our Telegram Channel

শুরুর আগে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত। আর মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ কোরো না।[১]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا ﴿۱﴾

হে মানুষ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে; এরপর তাদের দুজন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত নরনারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের কাছে চেয়ে থাকো। আর সতর্কতা অবলম্বন করো আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন।[২]

[১] সূরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১০২

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[১]

নিশ্চয় সবচেয়ে সুন্দর বাণী হলো আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের ক্ষেত্রে) নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ। কারণ প্রতিটি নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত। আর বিদআত মাত্রই পথভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্টতার স্থান কেবলই জাহান্নাম।

এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর জীবন নিয়ে। তার মতাদর্শ কিংবা অবদান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা এ বইয়ের লক্ষ্য নয়। কারণ এই স্বল্প পরিসর তার মতাদর্শ ও অবদানের মতো ব্যাপ্ত বিষয় উপস্থাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। একজন আলিম, ইমাম কিংবা শাইখুল ইসলাম হিসেবে নয়; বরং এই বই সর্বপ্রথম তাকে চিত্রিত করবে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে। বইটি পাঠককে দেখাবে, কীভাবে একজন মুসলিম এক অত্যুজ্জ্বল চিন্তার অধিকারী মহামনীষীতে পরিণত হয়, কীভাবে একজন মুসলিম তার কথায় ও কাজে পরিণত হয় কুরআন ও সুন্নাহর জীবন্ত প্রতিচ্ছবিতে।

বইটিতে আমরা দেখব, একজন শাইখুল ইসলাম জীবন-প্রভাত থেকে জীবনের শেষবেলা অব্দি ইলম-সাধনায় মগ্ন আছেন। দেখব, প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার ওপর জুলুমকারীদের তিনি নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দিচ্ছেন, জীবনের কঠিনতম বিপদকেও আল্লাহর অপার অনুগ্রহ হিসেবে মেনে নিচ্ছেন।

আমরা আরও দেখব, শুধু কথা কিংবা কলমে নয়; তরবারি দিয়েও তিনি জিহাদ করছেন সমানতালে। আবার দেখব, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র, বিরুদ্ধবাদী, দূর কিংবা কাছ থেকে তার সাথে সম্পর্ক রাখা প্রতিটি মানুষের প্রতি তার স্নেহমায়া, ভালোবাসা ও সদাচারের এক অনুপম চিত্র।

আমাদের সামনে ফুটে উঠবে, একজন আল্লাহওয়ালা আলিম যখন একমাত্র আল্লাহর

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৭০-৭১

জন্য ইখলাস অবলম্বন করেন, তখন তার স্বীকৃতি হয় দুনিয়াজোড়া। তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এই স্বীকৃতি বহুবার প্রকাশ পেয়েছে মানুষের সীমাহীন ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ঠিকই বলেছেন, 'বিদআতিদের বলে দাও, আমাদের আর তোমাদের পার্থক্য প্রকাশ পাবে জানাযার দিন।'[১]

[১] *সুয়ালাতুস সুলামি*, দারাকুতনি, পৃষ্ঠা : ৩৬১; *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ*, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৬০; বর্ণনাটি সহিহ।

সমকালীন প্রেক্ষাপট

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার সময়কাল ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও দুর্যোগপূর্ণ। তার জন্মের মাত্র তিন বছর পূর্বে আলেপ্পো ও দামেশকে তাতারদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; বাগদাদের পতন হয় এরও দুই বছর আগে। শৈশবের যে সময়টাতে আমরা ঘুমপাড়ানি গান শুনে, মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছি, সেসময়টাতেই তিনি তাতারদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনি শুনে বেড়ে উঠেছেন। কৈশরের যে সময়টাতে আমরা মাঠে-ঘাটে আর বিল-বাওরে চরে বেড়াই, সেসময়টাতে হয়তো তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন দিজলা ও ফুরাতের রক্তস্রোতে।

তাতাররা যখন তার প্রিয় জন্মভূমি হাররানের ওপর নগ্ন হামলা চালায়, তিনি তখন সাত বছরের শিশু। সেই শৈশবেই তিনি তাতারদের হত্যা, লুণ্ঠন ও নিষ্ঠুর বর্বরতা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। মায়ের কোলে মাথা রেখে বর্বরতার যে ঘটনা শুনেছেন, বাস্তবতার সামনে সেগুলো ছিল নিতান্তই তুচ্ছ। একসময় অতিষ্ঠ হয়ে পরিবারের সঙ্গে রওনা করেন দামেশক অভিমুখে। সেদিন শুধু তিনি এবং তার পরিবারই নয়; তার মতো হাজারো শিশু, হাজারো পরিবার চিরচেনা জন্মভূমি ছেড়ে পা বাড়িয়েছিল অজানার পথে।

শৈশবের এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তার স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা নয়। কারণ একটি জনপদ শত্রুপক্ষের পদানত হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে সে ইতিহাস চর্চিত হতে থাকে। গল্পের আড্ডায়, কবিতা ও সংগীতে এবং রচনা ও বক্তৃতায় বারবার তা ফিরে ফিরে আসতে থাকে। তাই অনুমান করা যায়, শৈশবের এই অভিজ্ঞতা ও পরাজয়ের গ্লানি তার মন-মানসে প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক করেছিল; সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তার ব্যক্তিত্ব গঠন ও চিন্তার বিনির্মাণে।

তাছাড়া এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, কোনো অঞ্চল বিজিত হলে কিংবা কোথাও উপনিবেশ বিস্তার লাভ করলে, সেখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক এবং ধর্মীয় অবস্থার অবনতি ঘটে; কখনো-বা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই সাথে স্থানীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশও ঘটে বহিরাগত সংস্কৃতির। ফলে সব দিক থেকে সেখানে অস্থিরতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এমনই সংগ্রামমুখর উত্তাল একসময়ে উত্থান ঘটেছিল ইমাম ইবনু তাইমিয়ার। কাজেই তার সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও মনমানস বিশ্লেষণ করতে হলে এবং সেই সাথে সেগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন পেশ করতে হলে, তার সমকালীন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা করা দরকার।[১]

রাজনৈতিক অবস্থা

ইবনু তাইমিয়ার জন্মের ১৩ বছর পূর্বে মিশর ও সিরিয়ায় দাস বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা আইয়ুবি বংশের শেষ সুলতান আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবের (মৃত্যু : ৬৮৭ হিজরি) তুর্কি গোলাম ছিলেন। সুলতান তাদের আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে মিশরে জায়গির প্রদান করেন। তারা বাহরিয়া উপাধিতে বিখ্যাত হন; এমনকি একসময় সেনা ও প্রশাসনিক পদেও নিযুক্তি লাভ করেন।

তাদের একজন সাহসী সেনা ছিলেন ইযযুদ্দিন আইবেক আত-তুর্কমানি। তিনি ৬৪৭ হিজরিতে আল-মালিকুস সালিহের স্থলাভিষিক্ত শাসক তুরান শাহকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন এবং আল-মালিকুল-মুইয উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রে ৬৫৫ হিজরিতে তিনিও নিহত হন। তখন তার পুত্র নুরুদ্দিন আলি তার স্থলাভিষিক্ত হন। ৬৫৭ হিজরিতে ইযযুদ্দিন আইবেকের গোলাম সাইফুদ্দিন কুতুয সিংহাসন দখল করেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাতারদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। এর পরের বছর (৬৫৮ হিজরি) আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবের অপর ক্রীতদাস রুকনুদ্দিন বাইবার্স সাইফুদ্দিন কুতুযকে হত্যা করেন। দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। তাতার ও ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজিত করে গৌরবদীপ্ত বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

তার শাসনামলেই ইবনু তাইমিয়া জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের পুরোটা সময় কাটে তারই বিজয়াভিযান দেখে। তার মৃত্যুর সময় ইবনু তাইমিয়া ছিলেন ১৫ বছরের তরুণ। সুলতান সালাহুদ্দিনের পরবর্তী মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সর্বাত্মকভাবে জিহাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তারই সুবাদে ইসলামের শত্রুদের উপর্যুপরি পরাজিত করতে সক্ষম হন।

---

[১] আবুল হাসান আলি নদভির *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ* ও ড. আলি সাল্লাবির *দাওলাতুল মুগোল ওয়াত তাতার* অবলম্বনে।

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ সুলতান সম্পর্কে অভিমত পেশ করতে গিয়ে বলেন—

বাইবার্সের মেধা ছিল ক্ষুরধার। মনোবল ছিল উন্নত। বীরত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিরোধ্য। তিনি শত্রুদের ব্যাপারে সদা তৎপর থাকতেন; তাদের গতিবিধির প্রতিও নজর রাখতেন। সেই সাথে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীকে এক পতাকাতলে সমন্বিত করার চেষ্টা করতেন। এসমস্ত গুণের কল্যাণেই তিনি ইসলামের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিমদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বস্তুত মহান আল্লাহ তাকে শেষ জামানার অধঃপতিত মুসলিমদের সাহায্য ও শক্তি যোগাবার জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেছিলেন। তিনিও এই অভিপ্রায় রক্ষায় সফল হয়েছিলেন। রাজ্যে তিনি মদ পান নিষিদ্ধ করেছিলেন। অপরাধপ্রবণ ও দুশ্চরিত্র লোকদের দেশ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। কোথাও অনাসৃষ্টি ও অন্যায় দেখামাত্রই অস্থির হয়ে উঠতেন। সেটা নির্মূল করার আগ পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না। এসব কারণে ফিরিঙ্গি, তাতার ও পৌত্তলিক মুশরিকরা তাকে একদমই সহ্য করতে পারত না।[১]

তার সাম্রাজ্য ছিল বহুদূর বিস্তৃত। প্রাচ্যে ফোরাত নদী থেকে দক্ষিণে সুদানের শেষাংশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। শাসন ছিল সুসংহত, শাসিতরা ছিল অনুগত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল মিশর। আর রাজধানী ছিল কায়রো। তার অব্যাহত প্রচেষ্টা ও ইতিবাচক রাজনীতির কল্যাণে এই কায়রো তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া তিনি নিজ উদ্যোগে সেখানে বহু মসজিদ, মাদরাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানেই কায়রো হয়ে উঠে আলিম ও বিদ্যার্থীদের প্রাণকেন্দ্র।

বাইবার্সের ১৮ বছরের সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল ও সুসংহত শাসনের পর[২] মিশর ও সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় খুব দ্রুত বেশ কয়েকজন সুলতানের আগমন-নিষ্ক্রমণ ঘটে। ৬৭৬ হিজরিতে বাইবার্সের মৃত্যুর পর থেকে ৭০৯ হিজরি পর্যন্ত (৩৩ বছরে) মোট নয় জন সুলতান মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাদের মধ্যে কেবল আল-মালিক আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন ছিলেন তেজোদীপ্ত, ন্যায়বিচারক এবং জিহাদি চেতনার ধারক। তিনি ৬৭৮ হিজরিতে তাতারিদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেন। দীর্ঘ ১৮৫ বছর ধরে ক্রুসেডারদের দখলে

[১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ২৭৬

[২] উল্লেখ্য, 'বাইবার্সের হাতে ইসলামের নবজাগরণ ও জিহাদি চেতনার প্রসার ঘটেছে' এ কথা যেমন সত্য। তেমনই এটাও সত্য, তিনি ছিলেন অনেকটা একনায়ক ও স্বৈরশাসক। এ কারণেই স্বৈরশাসকদের সহজাত দুর্বলতাগুলো তার মধ্যেও ক্রিয়াশীল দেখা যায়।

খাকা ত্রিপোলি জয় করেন। ৬৭৮ থেকে শুরু করে ৬৮৯ হিজরি পর্যন্ত ১২ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। মানসুর কালাউনের পর মিশরের সিংহাসন পুনরায় সুলতান ও যুবরাজদের প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত ৭০৯ হিজরিতে মানসুর কালাউনের পুত্র আল-মালিক আন-নাসির মুহাম্মাদ ইবনু কালাউন তৃতীয়বারের মতো শাসন ক্ষমতা হাতে নেন এবং ৩২ বছর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখেন। আল-মালিক আন-নাসির ছিলেন ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সমসাময়িক, যার সঙ্গে তার সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্ম ও ইতিহাসের সম্পর্ক রয়েছে। এই সুলতান ছিলেন অনেকটা সুলতান জাহির বাইবার্সের স্থলাভিষিক্ত। অনেক গুণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার সাক্ষাৎ নমুনা। ছিলেন তার পিতা মানসুর কালাউনের জীবন্ত স্মৃতি। তার শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যে অভূতপূর্ব ঐক্য ও শক্তির সঞ্চার হয়। তিনি তার খ্যাতিমান পূর্বসূরিদের ন্যায় তাতারিদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গৌরবোজ্জ্বল বিজয় ছিনিয়ে আনেন এবং বিশ্বময় মুসলিম রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই গোটা সময়ে ইরাক, ইরান ও খোরাসান তাতারদের অধীনে থাকে। বাগদাদ মুসলিমদের হাতে ফিরে আসে তাতারদের ইসলামগ্রহণের মধ্য দিয়ে। অবশ্য জাহির বাইবার্স অনেকবারই বাগদাদ পুনর্দখলের চেষ্টা চালিয়েছেন; কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয়নি।[১][২]

সাম্রাজ্যের রীতিনীতি

ইসলামই ছিল মামলুক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সুলতান, সরকারি কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রের সদস্যবৃন্দ ইসলামকে ভালোবাসতেন। ধর্মের প্রতি তারা ছিলেন সহানুভূতিশীল। কাজি, ইমাম, শাইখুল ইসলাম ও ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদের যথানিয়মে নিযুক্ত করা হতো। ন্যায়পাল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মামলা-মোকদ্দমায় কাজির ফয়সালাই ছিল চূড়ান্ত ও অবশ্যপালনীয়। মাদরাসাগুলোতে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় শিক্ষা চলত। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের গোটা ব্যবস্থাপনার মূল চালিকাশক্তি ছিল স্বয়ং সুলতান এবং তার আস্থাভাজন মন্ত্রী ও সভাসদ। তাদের অভিরুচি ও সিদ্ধান্তই ছিল সাম্রাজ্যের সংবিধান।

তাদের সুবিশাল সাম্রাজ্যে ইসলামি আইনের প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল নামেমাত্র। রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ও ব্যবস্থাপনা ছিল আধা-সামরিক গোছের—যার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত কোনো সংবিধান ছিল না; ছিল না সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি কিংবা পরামর্শসভা। অবশ্য জাহির

---

[১] উল্লেখ্য, মামলুক সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় কেবল মিশর, সুদান, সিরিয়া ও হিজাযই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[২] অবলম্বনে : *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ*, শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি; *দাওলাতুল মুগোল ওয়াত তাতার*, ড. আলি সাল্লাবি।

বাইবার্স ও তার স্থলাভিষিক্ত সুলতানগণ চেষ্টা করতেন, যেন সাম্রাজ্যের আইনকানুন, বিধিবিধান ও তাদের কার্যাবলির পক্ষে তৎকালীন আলিমদের সমর্থন ও সত্যায়ন থাকে। অন্য কথায়, তারা আলিমদের তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এমনও হয়েছে যে, আলিমগণের আপত্তি ও বিরোধিতার কারণে সুলতান কোনো ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছেন। একবার জাহির বাইবার্স মিশর ও সিরিয়ার সমস্ত জমিদারি ও জায়গির রাষ্ট্রের মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করেন। এতে বাইবার্স তার প্রতি ভীষণ রুষ্ট হন। পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝতে পেরে ইমাম নববি দামেশক ছেড়ে চলে যান। তবে তার এই বিরোধিতার ফল এতটাই সুদূর প্রসারী হয় যে, সুলতান ভূমি আইনে ন্যূনতম পরিবর্তন আনতেও ব্যর্থ হন। ফলে বাধ্য হয়ে আগের আইনই বলবৎ রাখতে হয়।

শাসকশ্রেণির এই সদিচ্ছা ও ঔদার্য দেখে, এমনটা ভাবার সুযোগ নেই যে, সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা সামগ্রিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ শাসক নির্বাচন, পদায়ন ও অপসারণের ক্ষেত্রে তারা ইসলামি নির্দেশনা ও রীতিনীতির ধারেকাছেও ছিলেন না। বরং এসব বিষয়ে তারা উত্তরাধিকার নীতি ও ঐতিহ্য মেনে চলতেন। যিনি শক্তি, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বে বিশেষ স্বাক্ষর রাখতে পারতেন, ক্ষমতার লাগাম থাকত তারই হাতে।

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসগণ নিজেদের ভক্তি ও নিষ্ঠাবলে প্রথমে মুনিবদের মন জয় করেন। এরপর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদে আসীন হন। সময়ের পরিবর্তনে একসময় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেন এবং এ ধারা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে। তারা সকলেই সাম্রাজ্যের পরবর্তী কর্ণধার হিসেবে তাদের সন্তানদের নিযুক্ত করার চেষ্টা করতেন। প্রায়শই তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হতো। ক্রীতদাসদের মধ্যে যার সাহস, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্ব সবচেয়ে বেশি, তিনি নবাগতকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করতেন।

যোগ্যতাবলে সিংহাসন ও মুকুট ছিনিয়ে নেওয়ার এই প্রবণতা বংশের উচ্চাভিলাষী সদস্যদের পরীক্ষার মুখে ফেলে দিত। তাদের মধ্যে অন্তঃকলহ ও যুদ্ধ-সংঘাত ছিল নিয়মিত ব্যাপার। তবে এই অশুভ প্রবণতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রশ্নে তারা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। দেখা যেত, তাতার কিংবা ফিরিঙ্গিদের উৎপাত ও আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেওয়ামাত্রই তারা সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে এক কাতারে এসে দাঁড়াতেন।[১]

---

[১] অবলম্বনে : *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ*, শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি; *দাওলাতুল মুগোল ওয়াত তাতার*, ড. আলি সাল্লাবি।

সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা

তুর্কি বংশোদ্ভূত শাসকশ্রেণির মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ববোধের অনুভূতি ছিল খুবই প্রখর। প্রতিটি বিষয়ে তারা সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে নিজেদেরকে অনন্য উচ্চতায় দেখতে চাইতেন। জীবন ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তুর্কি ভাষার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতেন। আরবি ব্যবহার করতেন কেবল ইবাদত পালন ও আলিমদের সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রয়োজনে। এতকিছু সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এমন অনেক আরবি সাহিত্যিক ও ভাষাবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান স্বয়ং আরবি ভাষাভাষীদের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করত।

ব্যক্তিজীবনে তারা ছিলেন যথেষ্ট ধার্মিক। আলিমদের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। জ্ঞানীগুণী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি তাদের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তারা প্রচুর মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করতেন। রাষ্ট্রীয় পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণত বিশেষ কোনো গোত্র, বংশ বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুকূল্য দেখাতেন না। যোগ্যতা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে পদায়ন করতেন। তবে গুরুদায়িত্ব ও সামরিক পদে নিযুক্তির বেলায় সংগত কারণেই তুর্কি বংশোদ্ভূত নেতৃবর্গের প্রাধান্য থাকত। জায়গিরদারিও সাধারণত তুর্কি ও তাতারদের হাতেই থাকত। তারা কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রম থেকে লাভবান হতো।

৬৯৭ হিজরিতে সুলতান হুসামুদ্দিন লাজিন একবার ভূমি-আইন সংস্কারের চেষ্টা করেন। তার আইনে কৃষকদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষিখাতে উন্নতির বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়। কিন্তু এ কারণে তাকে উপদেষ্টা ও সহকারী কর্মকর্তাদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়।

শহরাঞ্চলগুলোতে তুর্কিদের বাইরে তাতাদেরও বিরাট একটি অংশ বসবাস করত। সাইফুদ্দিন কুতুয, জাহির বাইবার্স ও নাসিরউদ্দিন কালাউন তাতারদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ পরিচালনা করেন, সেসব যুদ্ধে অগণিত তাতার বন্দি হয়। তাদেরকে মিশর ও সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে মিশর ও সিরিয়ায় তাতারদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবাস গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক মাকরিযির[১] বর্ণনামতে, জাহির বাইবার্সের শাসনামলে বিপুলসংখ্যক তাতার বন্দি হয়। মিশর ও সিরিয়ায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের গলিঘুপচিতে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবাস গড়ে ওঠে। ফলে তাদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ দেশময় ছড়িয়ে পড়ে।

---

[১] ইমাম মাকরিযি রাহিমাহুল্লাহ ৭৬৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ণ নাম তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আলি। তিনি ৮৪৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [দেখুন, *আয-যাওউল লামি*, ইমাম সাখাবি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১; *আল-বাদরুত তালি*, শাওকানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৯]

মুসলিমদের সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের কল্যাণে একসময় তারা ইসলামের ছায়াতলে ঠাঁই খুঁজে নেয় ঠিকই, কিন্তু তাদের অনেকেরই পুরোনো অভ্যাস ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য আগের মতোই অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। সামগ্রিকভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে নিজেদের পুরোনো ধ্যানধারণা, জাতিগত অভ্যাস ও মানবীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে একটি জাতির কেবল ইসলাম অভিমুখী হওয়ার উদাহরণ ইতিহাসে খুবই কম। যেমনটা করতে পেরেছিলেন আল্লাহর রাসুল ও তার সাহাবিগণ। তাদের জীবনে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্ব সর্বাংশে মিটে গিয়েছিল। তারা ইসলামে নতুনভাবে জন্ম লাভ করেছিলেন।

বস্তুত যে যুগ ও সমাজে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষার শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা থাকে না, যেখানে নওমুসলিমদের আকৃষ্ট করা কিংবা একেবারে গোড়া থেকে ঢেলে সাজাবার সক্ষমতা থাকে না, সেখানে তাদের আমূল পরিবর্তন আশা করা যায় না। কাজেই তাতারদের ক্ষেত্রেও এটা আশা করা সমীচীন নয় যে, তারা তুর্কি বংশোদ্ভূত অনারবদের থেকে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-চেতনা এমনভাবে গ্রহণ করবেন, যেখানে তাদের পুরোনো অভ্যাস ও ধ্যানধারণার লেশমাত্র থাকবে না। বরং তাদের জীবন যে কিছুটা দোটানাপূর্ণ হবে, তাদের ধর্ম আলো-আঁধারে ছাওয়া হবে, এমনটাই ছিল স্বাভাবিক।

মিশরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাকরিযি বলেন—

যুদ্ধবন্দি তাতারদের প্রশিক্ষণ মুসলিম দেশেই হয়েছিল। কুরআনের শিক্ষা তারা বেশ ভালোভাবেই লাভ করেছিল। ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কেও তাদের যথেস্ট ধারণা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জীবন ছিল হক ও বাতিলের মিশ্রণে পূর্ণ। তাদের মধ্যে ইতিবাচক দিক যেমন ছিল, নেতিবাচক দিকও ছিল। তারা সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত যথাযথভাবে পালন করত। ওয়াকফ সম্পত্তি, এতিমের ভরণপোষণ, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পারস্পরিক দ্বন্দ্বনিরসন এবং এ জাতীয় অন্যান্য সমস্যায় কাজির শরণাপন্ন হতো। কিন্তু নিজেদের ব্যাবহারিক জীবনে চেঙ্গিস সুলভ আচরণ করত। এসব ব্যাপারে তারা ছিল চেঙ্গিস খান কর্তৃক প্রণীত ইয়াসা সংবিধানের[১] অন্ধ সমর্থক।[২] এই সংবিধান মেনেই তারা নিজেদের দৈনন্দিন

---

[১] এ সংবিধান ইয়াসিক নামেও পরিচিত।

[২] শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ বলেন, তাতাররা পরিচালিত হতো তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের রচিত শাসনব্যবস্থা ও আইনকানুনের দ্বারা। যার নাম আল-ইয়াসা বা আল-ইয়াসিক। তারা সামগ্রিকভাবে এই বিধান প্রয়োগ করত। এটি ছিল তাদের 'পবিত্র সংবিধান।' মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করার সময়ও তারা এটি সাথে করে নিয়ে যেত এবং এ সংবিধানকে তারা বাস্তবায়ন করত। [*আল-হুকমু বি গাইরি মা-আনযালাল্লাহ*, আব্দুর রহমান ইবনু সালিহ, পৃষ্ঠা : ২৫২-২৫৩; বইটি ইলমহাউজ পাবলিকেশন থেকে *অপরিহার্য শরীয়াহ* নামে অনূদিত হয়েছে।]

জীবনে সংঘটিত দ্বন্দ্ব ও সমস্যাবলি নিরসনের জন্য হাজিব[১] নামে একজন বিচারক নিযুক্ত করে রেখেছিল। এই বিচারক মানবরচিত ইয়াসা আইন অনুযায়ী সবলদের সামাল দিতেন এবং দুর্বলদের অধিকার আদায় করতেন। তাদের পারস্পরিক লেনদেন তদারকি করতেন। জমিদারি ও জমিজামা-সংক্রান্ত বিবাদ মিটাতেন।

সহাবস্থানের কারণে তুর্কি বংশোদ্ভূত অনারব ও তাতার নও-মুসলিমদের সভ্যতা, জীবনাচার, সামাজিকতা ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব প্রাচীন আরব ও মুসলিম জনবসতির

ইমাম মাকরিযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পশ্চিমের তাতারি রাষ্ট্রের নেতা চেঙ্গিস খান যখন রাজা ওং খানকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে, তখন সে নিজস্ব কিছু নীতি ও শাস্তি নির্ধারণ করে। এগুলো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে নাম দেয় 'ইয়াসা'। কিছু লোক যদিও 'ইয়াসাক' উচ্চারণ করে, কিন্তু আদি উচ্চারণ ইয়াসা। সেসব আইনকানুন লেখা শেষ হওয়ার পর চেঙ্গিসের নির্দেশে তা লোহারপাতে খোদাই করা হয়। জনগণের ওপর সংবিধান হিসেবে সে একে নির্ধারণ করে দেয়। তার মৃত্যুর পরেও তাতাররা সেটি আঁকড়ে ধরে থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন। চেঙ্গিস খান প্রচলিত কোনো ধর্ম অনুসরণ করেনি। চেঙ্গিসের পর তাতাররা ইয়াসা থেকে বের হয়নি, এর মাধ্যমেই শাসন করতে থাকে। [*আল-খিতাতুল মাকরিযিইয়া,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৯, বুলাক এডিশন]

আল-কালকাশান্দি উল্লেখ করেন, চেঙ্গিস খান ইয়াসা তৈরি করে এর মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করে। পরবর্তী প্রজন্মগুলোও অনুসরণ করে চেঙ্গিস খানের আদর্শ। ইয়াসার আইনগুলো চেঙ্গিস তৈরি করেছিল নিজস্ব ভাবনা থেকে। সেখানে বিভিন্ন বিচার ও শাস্তির বর্ণনা ছিল, যার মধ্যে ইসলামি শরিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশই ছিল শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। [*সুবহুল আ'শা,* আল-কালকাশান্দি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১০]

[১] শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ বলেন, তার সময়কার হাজিবের (আক্ষরিক অর্থে শাসকদের দারোয়ান) ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল-মাকরিযি লিখেছেন—

'এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব ছিল সৈনিক ও তাদের কমান্ডারদের মধ্যে বিচার করা। মাঝে মাঝে তারা স্বাধীনভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিচার করত আবার কখনো পরামর্শ গ্রহণ করত শাসক বা তার সহকারীর। কিন্তু হাজিবদের বিচার সীমাবদ্ধ ছিল সৈনিকদের মধ্যকার বিবাদ, ভূমি বণ্টন ও অন্যান্য বিষয়-সংক্রান্ত মতপার্থক্যের মধ্যে।

হাজিবদের কেউই অতীতে শরিয়া-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ কিংবা ঋণ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে বিবাদ, ইত্যাদি নিয়ে রায় দিত না। শরিয়া অনুযায়ী মীমাংসার এসব বিষয় তারা হস্তান্তর করত কাজিদের কাছে। প্রায়ই দেখা যেত, কাতিব ও জামিনদাররা হাজিবদের দরবার থেকে পালিয়ে কাজির দরবারে এসে শরিয়ার আইনে বিচার চাইত। আর একবার কোনো কাজির দরবারে মামলা উপস্থিত হলে কেউ তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিতে পারত না...।' [*আল-খিতাতুল মাকরিযিইয়া,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৯, বুলাক এডিশন]

পরবর্তী সময়ে হাজিবদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাদের অবস্থান চলে আসে কাজিদের সমান্তরালে। আল-মাকরিযি বলেন, 'এরপর সবকিছু বদলে গেল। যেসব কমান্ডার আজ (মাকরিযির সময়কার) মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করে, তাদের অনেকের ক্ষেত্রে 'হাজিব' পদবী ব্যবহার করা হয়...আজকের হাজিবরা যেকোনো যেকোনো বিষয়ে বিচার করে। সেই রায় শরিয়া মোতাবেক হোক কিংবা না হোক। শরিয়া বহির্ভূত রায়কে তারা বলে সিয়াসাহ। শরিয়া কোর্টের কোনো কাজিও বিচারপ্রার্থীকে (বাদী) হাজিবদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতো না।' [*আল-খিতাতুল মাকরিযিইয়া,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৯-২২০, বুলাক এডিশন; *আল-হুকমু বি গাইরি মা-আনযালাল্লাহ,* আব্দুর রহমান ইবনু সালিহ, পৃষ্ঠা : ২৫৩-২৫৪]

ওপর পড়া ছিল অনিবার্য। ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে ইউরোপ ও এশিয়ার যেভাবে সম্মিলন ঘটেছিল, ঠিক সেভাবেই তাতার আক্রমণ ও তাদের জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছিল। এই মিলন ও মিশ্রণ যুদ্ধক্ষেত্রের সংঘাত থেকে শুরু হলেও, শেষ হয়েছিল চিন্তা, সভ্যতা ও চারিত্রিক সংমিশ্রণের ভেতর দিয়ে। প্রত্যেকেই যেমন অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনই একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিল।

শিক্ষা ও জ্ঞান

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ হিজরি সপ্তম শতকের শেষার্ধ এবং অষ্টম শতকের প্রথমার্ধের কিছু অংশ পেয়েছিলেন। এই দুই শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বেশ কয়েকজন কর্মবীর আলিম ও বিখ্যাত মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, আল্লামা তাকিউদ্দিন আমর ইবনুস সালাহ[১], শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দিন ইবনু আব্দিস সালাম[২], ইমাম মুহিউদ্দিন আন-নববি[৩], শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনু দাকিকিল ইদ[৪], আল্লামা আলাউদ্দিন আল-বাজি[৫], আল্লামা জালালুদ্দিন আবুল হাজ্জাজ আল মিযযি[৬], হাফিজ আলামুদ্দিন আল-বিরযালি[৭] এবং আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি[৮]। এরা সকলেই ইসলামের মুখপাত্র এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শেষোক্ত চারজন তো রীতিমতো হাদিস ও বর্ণনাশাস্ত্রের চার স্তম্ভ হিসেবে গণ্য হতেন। তালিবুল ইলমরা মৌমাছির মতো তাদের চারপাশে ভিড় করতেন এবং জ্ঞানের আলো বুকে ধারণ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তেন।

---

[১] জন্ম : ৫৭৭ হিজরি, মৃত্যু : ৬৪৩ হিজরি

[২] জন্ম : ৫৭৮ হিজরি, মৃত্যু : ৬৬০ হিজরি

[৩] জন্ম : ৬৩১ হিজরি, মৃত্যু : ৬৭৬ হিজরি

[৪] জন্ম : ৬২৫ হিজরি, মৃত্যু : ৭০২ হিজরি

[৫] জন্ম : ৬৩১ হিজরি, মৃত্যু : ৭১৪ হিজরি

[৬] জন্ম : ৬৫৪ হিজরি, মৃত্যু : ৭৪৬ হিজরি

[৭] জন্ম : ৬৬৫ হিজরি, মৃত্যু : ৭৩৯ হিজরি

[৮] জন্ম : ৬৭৩ হিজরি, মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরি

এই সময়কালে জ্ঞানের প্রচার ছিল বিকাশমুখী। মিশর ও সিরিয়ায় আইয়ুবি ও মামলুক সুলতানদের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় মাদরাসা ছিল; দারুল হাদিসও ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা লাভ করত। বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার। সেখানে শোভা পেত জ্ঞানের প্রতিটি শাখার দুর্লভ বইপত্র ও গবেষণাপত্র। ছাত্ররা সেসব থেকে জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করতেন। কেবল মাদরাসা কামিলিয়ার[১] লাইব্রেরিতেই তখন লক্ষাধিক গ্রন্থ ছিল।

এই শতকে বহু কালজয়ী গ্রন্থ রচিত হয়। কিতাবগুলো সাধারণ ও বিশেষ মহলে আজও রেফারেন্স বই ও আকরগ্রন্থ হিসেবে বরিত হয়ে আসছে। যেমন, আল্লামা তাকিউদ্দিন ইবনুস সালাহর *মুকাদ্দিমা,* শাইখ ইযযুদ্দিন ইবনু আব্দিস সালামের *আল-কাওয়াইদুল কুবরা,* ইমাম নববির *শারহুল মুহাযযাব* ও *শারহু মুসলিম,* ইবনু দাকিকিল ইদের *আল ইমাম* ও *ইহকামুল আহকাম শারহু উমদাতিল-আহকাম,* আবুল হাজ্জাজ আল মিযযির *তাহযিবুল কামাল,* ইমাম যাহাবির *মিযানুল ইতিদাল* ও *তারিখুল ইসলাম।*

ফিকহি মাজহাবের মজবুত ভিত নির্মিত হয়েছে এরও আগে। তবে দিন যত গড়িয়েছে, অনুসারীদের নমনীয়তা ততই লোপ পেয়েছে। মুখে বলা হতো, সত্য চার মাজহাবের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ। কিন্তু কার্যত দেখা যেত, প্রতিটি মাজহাবের অনুসারীই 'সত্য কেবল তার মাজহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ' বলে মনে করছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের মাজহাবকে সত্য মনে করত। নমনীয়তা ও সৌজন্যের খাতিরে বড় জোর এতটুকু বলত, 'আমাদের ইমামের ইজতিহাদ সবই সঠিক; অবশ্য সেখানে ভুলের আশঙ্কাও রয়েছে। আর অন্যান্য ইমামের ইজতিহাদ ভুলে ভরা। অবশ্য সেগুলো সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।' এভাবে প্রত্যেক মাজহাবের অনুসারীরাই নিজেদের ফিকহি মাজহাবকে অন্যান্য ফিকহি মাজহাব থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করত। তারা বিশ্বাস করত, কেবল তাদের মাজহাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে সমর্থিত ও সংগৃহীত। তাদের সমস্ত মেধা, রচনা ও বর্ণনা শক্তির সবটুকুই কেবল নিজেদের ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রমাণে ব্যয়িত হতো। মাজহাব অনুসারীরা নিজেদের মাজহাবকে কোন দৃষ্টিতে দেখত এবং তাদের মধ্যে কী ধরনের মানসিকতা কাজ করত, নিচের ঘটনা থেকে তা আঁচ করা যাবে—

'মিশরে শাফিয়ি মাজহাবের প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই সেখানে কাজিউল কুজাত বা প্রধান বিচারক পদে শাফিয়ি মাজহাবের লোকেরাই নিয়োগ লাভ করতেন। কিন্তু সুলতান আল-মালিকুজ জাহির বাইবার্স একবার এই রীতির বাইরে গিয়ে বাকি তিন মাজহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকেও আলাদা

[১] ৬২২ হিজরিতে কায়রো শহরে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন আল-মালিকুল কামিল মুহাম্মাদ ইবনু আদিল আইয়ুবি।

আলাদা কাজিউল কুজাত নিযুক্ত করেন। ব্যাপারটি শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহগণের সহ্য হলো না। তারা সমগ্র মিশরকে শাফিয়ি মাজহাবের বিচারপতির অধীনে দেখতে চান। 'ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর সমাধি মিশরে হওয়ায় গোটা মিশরের ওপর একমাত্র শাফিয়ি মাজহাবের অধিকারই স্বীকৃত বলে তারা মনে করতেন। তাছাড়া এটা মিশরের ঐতিহ্যেরও অংশ।' এই মানসিকতা তাদের মধ্যে এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে, বাইবার্সের মৃত্যুর পরে যখন মিশরের শাসনক্ষমতা তার উত্তরসূরিদের হাত থেকে অন্যদের হাতে চলে যায়, শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারী ফকিহদের কেউ কেউ একে তার অপকর্মের শাস্তি ও আল্লাহর ফয়সালা বলে মনে করেন।'

মাজহাবের অনুসারীদের এই ফেরকাবাজি শুধু ফিকহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তা ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল আকিদার ক্ষেত্রেও। বরং বলা চলে, ইলমুল কালামের (কালাম শাস্ত্র) প্রবক্তা ও তার অনুসারীদের গোঁড়ামি সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আশআরিপন্থি ও হাম্বলি মতাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য বা সম্প্রীতি ছিল প্রায় অসম্ভব। কোন মাজহাব শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য—সেটা ছিল মাজহাবি বিতর্কের মূল প্রতিপাদ্য আর এই বিতর্ক ইসলাম বনাম কুফর পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। যে কারণে এগুলোকে কেন্দ্র করে একজন অপরজনকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্টও বলে ফেলতেন। নিজের বক্তব্যে তারা অনড় ও অবিচল থাকতেন। মোট কথা, আকাইদ-সংক্রান্ত বিতর্ক ও ইলমুল কালামের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সমস্ত বিতর্কে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। মানুষের আগ্রহের বস্তু ছিল এই বিতর্কগুলো। রাজন্যবর্গও এতে সীমাহীন মজা পেতেন। সাধারণ আর বিশিষ্টজন সকলেই ছিল এসবে মত্ত।

অপরদিকে তাসাউফ শাস্ত্রে যদিও সে যুগে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল, কিন্তু এর ভেতর বহু অনৈসলামি উপাদান ও ভাবধারা ঢুকে পড়েছিল। অনেক মতলববাজ মূর্খ ও পেশাদার বিদআতি এ দলে শামিল হয়ে শিরক-বিদআতের বাজার গরম করে তুলেছিল। তারা সাধারণ-বিশেষ-নির্বিশেষে সবাইকে গুমরাহ ও পথচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। দার্শনিকদের একটি দল দ্বীন ও নবিদের শিক্ষা থেকে সরে এসে দর্শনচর্চা এবং তার প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিল। অপর একটি দল দর্শনকেই সত্যের মাপকাঠি অভিহিত করে ধর্মকে এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইত; ঐশী বাণী ও মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালাত।

দার্শনিকদের এই দুই শ্রেণির মধ্যে অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয়ে বিরোধ বা ব্যতিক্রম থাকলেও সার্বিক বিচারে তারা ছিল এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর অন্ধ অনুসারী; তাদের চিন্তাধারার উৎকর্ষ, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা এবং অতি মানব হিসেবে তাদের উচ্চমর্যাদার ব্যাপারে সমান বিশ্বাসী ছিল এই দুই দল। এই ভক্তি ও বিশ্বাস তাদের মধ্যে এতটাই বিকার সৃষ্টি করেছিল যে, তারা তাদের মনোনীত পুরোধা ব্যক্তিদের চিন্তার ফলাফল

ও গবেষণা থেকে কিছুতেই পিছু হটতে পারত না; এমনকি ভাবতেও পারত না যে, তাদের থেকে ভুল দর্শন বা মতাদর্শ প্রকাশ পেতে পারে।

এমনই রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, চারিত্রিক, মানসিক ও জ্ঞানগত পরিবেশে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর আবির্ভাব ঘটে এবং এমন পরিবেশেই তিনি সংস্কার ও পুনর্জাগরণের পতাকা উড্ডীন করেন।[১]

---

[১] অবলম্বনে : *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ,* শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি; *দাওলাতুল মুগোল ওয়াত তাতার,* ড. আলি সাল্লাবি।

জন্ম, বংশপরিচয় ও শৈশবকাল

জন্ম

শামসুদ্দিন যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু তাইমিয়া ৬৬১ হিজরির ১০ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার হাররান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ণ বংশলতিকা, শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু শিহাবিদ্দিন আবিল মাহাসিন আব্দিল হালিম ইবনি শাইখিল ইসলাম মাজদিদ্দিন আবিল বারাকাত আব্দিস সালাম ইবনি আবি মুহাম্মাদ আব্দিল্লাহ ইবনি আবিল কাসিম খাজির ইবনি মুহাম্মাদ ইবনি খাজির ইবনি আলি ইবনি আব্দিল্লাহ ইবনি তাইমিয়া।[১]

পিতা ও পিতামহ

শাইখুল ইসলামের পিতার নাম শাইখ শিহাবুদ্দিন আবুল মাহাসিন আব্দুল হালিম ইবনি মাজদিদ্দিন আবিল বারাকাত আব্দিস সালাম ইবনু আবি মুহাম্মাদ আব্দিল্লাহ ইবনি আবিল কাসিম ইবনি তাইমিয়া।[২] তিনি তার পিতা শাইখ আব্দুল হালিমের কাছেই হাম্বলি মাজহাবের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে এই মাজহাবের ওপর গভীর ও ব্যাপক গবেষণা করেন। তারপর নিয়োজিত হন অধ্যাপনা, ফতোয়া ও রচনার কাজে। শাইখ শিহাবুদ্দিন আব্দুল হালিম একদিকে যেমন ছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষক ইমাম; অপরদিকে তেমনই ছিলেন বিনয়ী, সজ্জন ও উত্তম চরিত্রের

---

[১] *আল-উকুদুদ দুররিইয়্যাহ*, ইবনু আব্দিল হাদি হাম্বলি, পৃষ্ঠা : ৬

[২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩২০

অধিকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইমাম যাহাবির ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন হিদায়াতের নক্ষত্র। তার ভাষায়, 'শিহাবুদ্দিন ছিলেন চাঁদের জোছনা; সূর্যের আলো।'[১]

কর্মজীবনে শাইখ শিহাবুদ্দিন ছিলেন দামেশকের দারুল হাদিস সুক্কারিয়ার প্রধান শাইখ। শুধু তা-ই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক হিসেবেও তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। তার জন্য সেখানে একটি আসন বরাদ্দ থাকত। তিনি প্রতি শুক্রবার সেই আসন অলংকৃত করতেন এবং সম্পূর্ণ স্মৃতির ওপর নির্ভর করে পুরো সময়জুড়ে হাদিস ও ফিকহের ওপর আলোচনা করতেন।[২]

পিতামহের পরিচয় ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি

শাইখুল ইসলামের পিতামহের নাম শাইখ মাজদুদ্দিন আবুল বারাকাত আব্দুস সালাম। তিনি ছিলেন একাধারে হাম্বলি ফকিহ, কারি, ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, উসুলবিদ, আরবি ব্যাকরণবিদ এবং হাফিজুল হাদিস। শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়া তার দাদার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের দাদা হাদিস মুখস্থকরণ এবং আলিমদের মাজহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে ছিলেন মহাবিস্ময়। তিনি অনায়াসেই সেগুলো মুখস্থ রাখতে পারতেন।'[৩]

তার সমকালীন আলিম ও বিশিষ্ট ভাষাবিদ শাইখ জামালুদ্দিন ইবনুল মালিক বলেন, 'দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য যেমন লোহাকে নরম করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনই শাইখ মাজদুদ্দিনের জন্য ফিকহশাস্ত্রকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে।'[৪]

সেসময়ে ফিকহ ও উসুলুল ফিকহে তার দক্ষতা ছিল নজিরবিহীন। হাদিস, তাফসির ও কিরাতশাস্ত্রেও তার দখল ছিল অসামান্য। তার হাতে রচিত হয়েছিল মূল্যবান ও কালজয়ী বহু গ্রন্থ। এসব কারণে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্বিদিক। তার সময়ে হাম্বলি মাজহাবের পাণ্ডিত্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী; অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠ।

শাইখুল ইসলামের দাদা শাইখ আব্দুস সালামের চাচার নাম ফখরুদ্দিন আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল খাযির। তিনিও ছিলেন একজন হাম্বলি ফকিহ, বিশিষ্ট

---

[১] চাঁদ বলে তিনি তার পিতা আব্দুস সালামকে এবং সূর্য বলে তিনি তার ছেলে শাইখ তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু তাইমিয়াকে বুঝিয়েছেন।

[২] *হাওলা হায়াতি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া*, মুহাম্মাদ সাইয়িদ রাসলান, পৃষ্ঠা : ৭

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, যাহাবি, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ২৯১-২৯৩

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, যাহাবি, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ২৯২; *নাইলুল আওতার*, শাওকানি, পৃষ্ঠা : ৩

কারি, বক্তা এবং হাররানের শাইখ ও খতিব। তিনি বাগদাদে গিয়ে ফিকহ এবং হাদিস অধ্যয়ন করেন। ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। ইবনুল জাওযির অনেক রচনা সরাসরি তার থেকে শ্রবণ করেন। তারপর ত্রিশোর্ধ্ব খণ্ডের বিশাল এক তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন।[১]

দাদির পরিচয়

শাইখুল ইসলামের দাদির নাম বাদরাহ বিনতু ফাখরিদ্দিন আবি আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনিল খাযির। তার উপনাম ছিল উম্মু বাদর। তিনি জিয়াউদ্দিন ইবনুল খারিফের অনুমতিক্রমে হাদিস বর্ণনা করতেন এবং নিয়মিত হাদিসের দারস দিতেন।[২]

সুতরাং বলতেই হয়, ইলমচর্চায় শাইখুল ইসলামের পরিবার ছিল নিবেদিত প্রাণ। ইলমের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল সুগভীর। তাই ইলমের সকল শাখায় তাদের যোগ্যতা স্বীকৃত; প্রতিভার স্বাক্ষর পরিস্ফুট। তাতারদের আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য যখন এই মহান পরিবার হাররান থেকে দামেশকে হিজরত করে, তখন তাদের সবচেয়ে ভারী মালামাল ছিল কিতাবপত্র। পথ ছিল ভীষণ দুর্গম; তার ওপর ছিল শত্রুর শ্যেনদৃষ্টি। এমন দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ পথে বইপত্রের বিশাল বোঝা বয়ে নিতে সেসময় তাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। মাঝপথে গাড়ির চাকা বিকল হওয়ায় শত্রুর হাতে পড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। আল্লাহ আপন দয়াগুণে সে যাত্রায় তাদের রক্ষা করেছিলেন।[৩]

পরবর্তীতে এই পরিবারটি দামেশকেই স্থায়ী হয়। শাইখুল ইসলামের বাবা শাইখ আব্দুল হালিম দারুল হাদিস সুক্কারিয়ার শাইখের পদ গ্রহণ করেন। সেখানেই তার ছেলে ইমাম আহমাদ তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়া বেড়ে ওঠেন।

তাইমিয়া নামে প্রসিদ্ধির কারণ

এই মহান পরিবার ঠিক কী কারণে 'তাইমিয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন, শাইখ আব্দুস সালামের দাদা মুহাম্মাদ ইবনু খাযির একবার তাইমা নামক অঞ্চল দিয়ে হজে গিয়েছিলেন।

---

[১] আস-সারিমুল মাসলুল, ইবনু তাইমিয়া, মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ৯

[২] আদ-দুররুল মুনাযযাদ, মুজিরুদ্দিন হাম্বলি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

[৩] আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ, ইবনু আব্দিল হাদি হাম্বলি, পৃষ্ঠা : ২

সেখানে তাইমিয়া নামের এক মেয়ে শিশুর সাথে দেখা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে হজ্ব থেকে ফিরে এসে দেখেন, তারও একটি মেয়ে হয়েছে। তখন তিনি সেই মেয়েটির নামে তার মেয়ের নাম রাখেন—'তাইমিয়া।'

কেউ কেউ আবার মনে করেন, শাইখ আব্দুস সালামের দাদা—মুহাম্মাদের মায়ের নাম ছিল তাইমিয়া। তিনি অত্যন্ত গুণবতী ও সজ্জন নারী ছিলেন। মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকতেন। দুনিয়ার বিষয়েও হিতোপদেশ দিতেন। আপন-পর—সবার কল্যাণ কামনা করতেন। তার দিকে সম্পৃক্ত করেই এই পরিবারকে 'তাইমিয়া' এবং এই পরিবারের মনীষীদের 'ইবনু তাইমিয়া' নামে ডাকা শুরু হয়। ফলে এ নামেই তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১]

দৈহিক গঠন

হাফিজুল হাদিস ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলামের গায়ের রং ছিল ফর্সা। চুল-দাড়ি ছিল ঘন কালো। পেকেছিল খুবই সামান্য। চুলগুলো থাকত কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত। চোখ দুটো ছিল হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। দেহের গড়ন ছিল মধ্যম আকৃতির। কাঁধ ছিল বেশ প্রশস্ত। কণ্ঠ ছিল ভরাট। কথা বলতেন বিশুদ্ধ ভাষায়। খুব দ্রুত পাঠ করতেন। পাঠে একধরনের ক্ষিপ্রতা অনুভূত হতো। কিন্তু স্বভাবসুলভ বুদ্ধিমত্তায় সেই ক্ষিপ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতেন। সার্বক্ষণিক আল্লাহমুখিতা এবং আল্লাহর সাহায্য ও দয়া প্রার্থনায় তার মতো আর কাউকে দেখা যায়নি।[২]

কয়েক টুকরো শৈশব

শৈশবে দ্রুত হিফজের পরীক্ষা

একবার হালাবের জনৈক শাইখ ইবনু তাইমিয়ার খোঁজে দামেশকে আসেন। লোকদের বলেন, শুনেছি, দামেশকে আহমাদ ইবনু তাইমিয়া নামে এক বালক আছে; সে নাকি খুব দ্রুত মুখস্থ করতে পারে! আমি কীভাবে তার সাক্ষাৎ পেতে পারি? এক দর্জি তাকে জানায়, ছেলেটি এ পথেই পাঠশালায় যায়। আজ এখনো যায়নি। আপনি এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। হয়তো তার সাথে দেখা হয়ে যাবে।

হালাবের শাইখ বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর একটি ছেলে সেই পথ ধরে এলো।

[১] ইবনু তাইমিয়া : হায়াতুহু ও আসরুহু, মুহাম্মাদ আবু যুহরা, পৃষ্ঠা : ১৭

[২] যাইলু তারিখিল ইসলাম (সালাসু তারাজিমা নাফিসাহ), যাহাবি, পৃষ্ঠা : ২৬-২৭

দর্জি শাইখকে বলল, ওই তো, বড় শ্লেট হাতে যে-ছেলেটি আসছে, সে-ই আহমাদ ইবনু তাইমিয়া। হালাবের শাইখ বালককে ডাকলেন। তার হাত থেকে শ্লেটটা নিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, খোকা! শ্লেটটা মুছো; আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা লিখতে দেব। ইবনু তাইমিয়া শ্লেটটা মুছলেন। শাইখ এগারোটি কিংবা তেরোটি হাদিস লেখালেন। তারপর বললেন, এবার হাদিসগুলো শোনাও।

ইবনু তাইমিয়া শ্লেটটা শাইখের হাতে দিয়ে বললেন, আমি বলছি, শুনুন। তারপর তিনি সুন্দরভাবে হাদিসগুলো পড়ে শোনালেন। হাদিসগুলো শুনে শাইখ বললেন, খোকা এগুলো মুছে ফেল। ইবনু তাইমিয়া মুছে ফেললেন। এবার শাইখ কয়েকটি নির্বাচিত হাদিসের সনদ লিখিয়ে বললেন, এগুলো পড়ো। ইবনু তাইমিয়া পূর্বের মতো এবারও চমৎকারভাবে সনদগুলো শুনিয়ে দিলেন। হালাবের শাইখ দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, এই ছেলে বেঁচে থাকলে, ভবিষ্যতে বড় কিছু হবে।[১]

বিস্ময়কর স্মরণশক্তি

ইমাম আবুল মুযাফফার আস-সুররামাররি তার হাদিস শ্রুতিলিখনের ৬৭তম মজলিসে মুখস্থশক্তি ও স্মরণশক্তির আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের সময়ে হিফজের ক্ষেত্রে মহাবিস্ময় ছিলেন শাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দিল হালিম ইবনি তাইমিয়া। কোনো কিতাব একবার পাঠ করলেই তার স্মৃতিতে সেটা খোদাই হয়ে যেত। এরপর ওই কিতাব না দেখেই অনায়াসে আলোচনা করতে পারতেন; এমনকি তার রচনায় শব্দে শব্দে উদ্ধৃতিও টানতে পারতেন।[২]

শাইখুল ইসলামের এক শাগরেদের কাছে আমি আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা শুনেছি। শাইখুল ইসলাম যখন ছোট ছিলেন, তখনকার কথা। শাইখুল ইসলামের বাবা একদিন তার ছেলেদের বাগানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন, আহমাদ! তুমিও আমাদের সাথে চলো। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। এরপরও বাবা তাকে অনুরোধ করলে, তিনি বললেন, বাবা, কিছু মনে করবেন না, আজ না যাই? অগত্যা বাবা তাকে রেখে অন্য ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

সারা দিন ঘোরাফেরা করে বিকেলে তারা ঘরে ফিরলেন। বাবা ইবনু তাইমিয়াকে বললেন, আহমাদ! তোমার ভাইয়েরা বারবার তোমার কথা মনে করেছে। তুমি ছিলে না তাই ওদের মনটা ভীষণ খারাপ ছিল। তুমি বাড়িতে থেকে কী করেছ? উত্তরে

---

[১] *আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৪

[২] *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৩; *আর-রাদ্দুল ওয়াফির*, ইবনু নাসিরউদ্দিন দিমাশকি, পৃষ্ঠা : ২৩৪-২৩৫

শাইখুল ইসলাম তার হাতের কিতাবটি দেখিয়ে বললেন, বাবা! আমি আজ এ কিতাবটি মুখস্থ করেছি। বাবা অবাক হয়ে বললেন, কী! পুরো কিতাবটা মুখস্থ করেছ? শোনাও তো দেখি! তৎক্ষণাৎ তিনি বাবাকে পুরো কিতাব শুনিয়ে দিলেন। বাবা তাকে কাছে টেনে কপালে চুমু খেলেন। তার মনে হলো, এই ঘটনা জানলে ছেলের নজর লাগতে পারে। তাই তিনি বললেন, আব্বু! এই কথা তুমি আর কাউকে বোলো না।[1]

আল্লামা সাফাদি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনামতে সেই মুখস্থকৃত কিতাবটি ছিল *রউযাতুন নাযির ওয়া জান্নাতুল মানাযির*।[2] লেখক ছিলেন ইমাম মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনি কুদামা।[3]

পাঠক পূর্বেই জানতে পেরেছেন, শাইখুল ইসলামের বাবা শাইখ আব্দুল হালিমের মেধা ও স্মৃতিশক্তি এতটাই প্রখর ছিল যে, তিনি দারুল হাদিস সুক্কারিয়ায় সম্পূর্ণ মুখস্থ পাঠদান করতেন, কোনো কিতাব বা নোটের সাহায্য নিতেন না। শাইখুল ইসলামের বাবার মতো তার দাদাও ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাই শাইখুল ইসলামের এমন বিস্ময়কর মেধার বহিঃপ্রকাশ দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

কুরআনের বিনিময় না নেওয়ার প্রত্যয়

হাফিজুল হাদিস ইমাম বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু তাইমিয়ার হিফজের শিক্ষক বলেন, 'ইবনু তাইমিয়া যখন ছোট ছিল, তখন তার বাবা আমাকে বলেছিলেন, কথা দিন, ছেলের হিফজ শেষ হওয়ার আগে আপনি তাকে ছাড়বেন না; বিনিময়ে প্রতি মাসে আমি আপনাকে ৪০ দিরহাম দেব। এ কথা বলে তিনি আমার হাতে ৪০ দিরহাম গুঁজে দেন।

আমি বলি, আপনি বরং দিরহামগুলো ইবনু তাইমিয়াকেই দিয়ে দিন। ছেলে মানুষ, দিরহামগুলো পেয়ে খুশি হবে। এতে হিফজের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়বে। আপনি তাকে বলুন, 'প্রতি মাসেই তুমি ৪০ দিরহাম করে পাবে।'

ছোট্ট ইবনু তাইমিয়াকে ব্যাপারটা জানানো হলে, সে উত্তর দেয়, আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, কখনো কুরআনের বিনিময় গ্রহণ করব না। এরপর সে সত্যি

[১] *আর-রাদ্দুল ওয়াফির*, পৃষ্ঠা : ২৩৪-২৩৫

[২] *আইয়ানুল আসর*, সাফাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৭

[৩] মৃত্যু : ৬২০ হিজরি

সত্যিই দিরহামগুলো আর নেয়নি। আমার মনে হয়েছে, শুধু আল্লাহর অনুগ্রহেই একটি শিশুর থেকে এমনটি ঘটতে পারে।

বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু তাইমিয়ার এই শিক্ষক সত্যই বলেছেন। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহই তাকে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এত সব কল্যাণের অধিকারী করেছে।[১]

ছোট্ট ইবনু তাইমিয়ার হাতে প্রতিবেশী ইহুদির ইসলামগ্রহণ

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া শৈশবে যখন পাঠশালায় যেতেন, তখন পথিমধ্যে এক ইহুদির সাথে তার দেখা হতো। ইহুদির বাড়ি ছিল পথের ধারে। ইহুদির দীর্ঘদিনের পুষে রাখা কিছু প্রশ্ন ছিল। ইবনু তাইমিয়ার মেধা দেখে একদিন সেই ইহুদি তার কাছে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে। ইবনু তাইমিয়া তৎক্ষণাৎ সেগুলোর সদুত্তর দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেন। এতে সেই ইহুদি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর থেকে যত বারই ইবনু তাইমিয়ার সাথে সে ইহুদির দেখা হতো, তত বারই তিনি ইহুদিধর্মের অসারতার ব্যাপারে নতুন নতুন তথ্য দিতেন। তার চিন্তা ও মনের গভীরে নতুন করে আলোড়ন তৈরি করতেন। এভাবে একদিন সে ইসলাম গ্রহণ করে। ছোট্ট ইবনু তাইমিয়ার বরকতে সে কুফরের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোতে প্রবেশ করে।[২]

[১] আল আলামুল আলিইয়াহ ফি মানাকিবি ইবনি তাইমিয়া, ইমাম বাযযার, পৃষ্ঠা : ২৭-২৮

[২] আল আলামুল আলিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ১৭

শিক্ষা-দীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা

ইলমের চর্চা ও প্রসার ছিল ইবনু তাইমিয়ার পারিবারিক ঐতিহ্য। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার পিতা ও দাদা ছিলেন নামকরা ব্যক্তিত্ব। ফলে বংশীয় ঐতিহ্য ও ইলমের পরিবেশেই জন্ম হয় তার। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন পরিবারে থেকেই। এরপর মনোনিবেশ করেন কুরআনের প্রতি। একসময় মুখস্থও করে ফেলেন গোটা কুরআনুল কারিম। সেই যে মুখস্থ করেছিলেন, তারপর আর কোনোদিন ভোলেননি। তিনি সারাজীবন যা-কিছু মুখস্থ করেছেন, তার খুব সামান্যই স্মৃতির আড়াল হয়েছে। শেষ বয়সেও যখন কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করতেন, মনে হতো যেন তার সামনে কুরআন খুলে রাখা হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তিনি যেকোনো ক্ষেত্রে সঠিক ও যথোপযুক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করতে পারতেন। বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকলে, কুরআন দেখে পাঠ করলেও অনেক সময় সঠিক আয়াতটি খুঁজে বের করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

উচ্চশিক্ষা

ইমাম আবু যুহরা বলেন, কুরআন হিফজের পর তিনি হিফজুল হাদিস, ফিকহ ও আরবি ভাষা অধ্যয়ন শুরু করেন। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ সিবাওয়াইহ কর্তৃক রচিত *আল-কিতাব* গ্রন্থটির তুলনামূলক পাঠ সম্পন্ন করেন। অন্যান্য ব্যাকরণগ্রন্থে পাওয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে সিবাওয়াইহের বেশকিছু নিয়মকানুনে ভিন্নমত পোষণ করেন। এভাবে আরবি ব্যাকরণে বিশেষ দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তিনি কারও ব্যাপারে মন্তব্য করতেন না; এমনকি দলিলহীন বাগাড়ম্বরেও উৎসাহ বোধ করতেন না।[১]

---

[১] *ইবনু তাইমিয়া : হায়াতুহু ও আসরুহু*, মুহাম্মাদ আবু যুহরা, পৃষ্ঠা : ২৩

গায়াতুল আমানির গ্রন্থকার বলেন, শৈশবে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করার পর তিনি হিফজুল হাদিস, ফিকহ ও আরবি ভাষা অধ্যয়ন শুরু করেন। একসময় এসব বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। এতকিছুর মধ্যেও পর্যাপ্ত সময় দেন বিভিন্ন মজলিসে দ্বীনি আলোচনা, হাদিস এবং সালাফদের বাণী ও নাসিহা শ্রবণে। সহিহ বর্ণনার একাধিক কিতাব তিনি বেশ কয়েকজন শাইখ থেকে শ্রবণ করেন। সহিহুল বুখারি, *সহিহ মুসলিম*, জামিউত তিরমিযি, সুনানু আবি দাউদ, *সুনানুন নাসায়ি*, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, *সুনানুদ দারাকুতনি*, মুসনাদু *আহমাদের* মতো হাদিসের বড় বড় কিতাব তিনি শ্রবণ করেছেন একাধিক বার।

তার মুখস্থ করা প্রথম হাদিসের কিতাবটি ছিল ইমাম হুমাইদি কর্তৃক রচিত *আল-জামউ বাইনাস সাহিহাইন।* ইবনু আব্দিদ দায়িম ও তার সমপর্যায়ের অনেক শাইখ থেকে তিনি হাদিস শুনেছেন। অনেকের কাছ থেকেই তিনি হাদিস পাঠ ও শ্রবণের অনুমতি পেয়েছিলেন। বড় বড় কিতাবের নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করতেন। জীবনের রক্তিম উষা থেকে বর্ণিল সাঁঝ পর্যন্ত তিনি নিমগ্ন ছিলেন হাদিস শ্রবণ ও ইলম অর্জনে।[১]

ইবনু আব্দিল হাদি মাকদিসি বলেন, 'শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া যেসকল শাইখের কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন, তাদের সংখ্যা দুইশরও বেশি। *মুসনাদু আহমাদ* কিতাবটি তিনি কয়েকবার শ্রবণ করেছেন। তার শ্রবণের তালিকায় এক খণ্ডের ছোট কিতাব যেমন রয়েছে; তেমনই রয়েছে একাধিক খণ্ডের বিশাল কিতাব এবং আকরগ্রন্থও। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, ইমাম তাবারানি রচিত *আল-মুজামুল কাবির।*

হাদিসের প্রতি তার গুরুত্ববোধ ছিল সীমাহীন। অধ্যয়নকালেই তিনি প্রতিটি হাদিসের অনুলিপি তৈরি করেছেন। গণিতশাস্ত্র ও হস্তলিপি শিক্ষা করেছেন শাস্ত্রীয় লোকদের থেকে। আনুষঙ্গিক জ্ঞানার্জন শেষে তিনি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন তাফসিরশাস্ত্রের প্রতি। একসময় এ শাস্ত্রেও পৌঁছে যান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। উসুলুল ফিকহ ও অন্যান্য শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছেন গভীরভাবে। এই বহুবিধ বিষয়ে বিস্তর জ্ঞানার্জন যখন শেষ করেন, তখন তার বয়স মাত্র ১৯ বছর বা তারচেয়েও কম।[২]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর কীর্তি ও অবদানের প্রতি তার মুগ্ধতা ছিল সীমাহীন। এ কারণে তিনি প্রিয় মানুষটির পদরেখা অনুসরণ করেই হাম্বলি ফিকহ অধ্যয়ন করেন। তার কাছে এই মহান ইমামের স্থান ছিল ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিরাট একটি অংশজুড়ে।

[১] গায়াতুল আমানি, মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৫

[২] গায়াতুল আমানি, মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮৮

তিনি যখন ফতোয়া দেওয়া শুরু করেন, তখন তার বয়স মাত্র ১৯ বছর কিংবা তারও কম। এই বয়সেই তিনি ফতোয়া দেওয়ার পাশাপাশি রচনা ও সংকলনের কাজ শুরু করেন। নিয়োজিত হন নিরবচ্ছিন্ন সাধনায়। তার বাবা ছিলেন প্রথম সারির হাম্বলি ফকিহ ও বিশিষ্ট ইমাম। তার বাবা যখন ইন্তেকাল করেন, তার বয়স তখনো ২০ বছর পেরোয়নি। বাবার ইন্তেকালের পর শাইখুল ইসলাম তার পদে অধিষ্ঠিত হন। সেসময় তার বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। হাদিসের মসনদে বসেই শাইখুল ইসলাম ইবনু দাকিকিল ইদের মতো যুগশ্রেষ্ঠ হাদিস-বিশারদদের[১] সমকক্ষ রূপে আবির্ভূত হন।[২] এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মূলত তার নাম ও কর্মের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়।

তখন থেকেই তিনি প্রতি জুমআয় মুখস্থ তাফসির করতে শুরু করেন। তার তাফসির ছিল সাবলীল ও সর্বজনীন। কুরআনের সূক্ষ্ম-জটিল বিষয়গুলো তিনি ব্যাখ্যা করতেন সহজভাবে। দারসের মজলিসেও তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। আলোচনা ছিল স্পষ্ট। ভাষা ছিল অকুণ্ঠ। শৈলী ছিল প্রাণবন্ত ও গতিময়।

প্রখর মেধা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনে শাইখুল ইসলাম ছিলেন আল্লাহর অনন্য নিদর্শন। সালাফদের ইখতিলাফ ও বর্ণনা-সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন এক মহাসাগর। ইলম, আমল, সাহসিকতা, বদান্যতা, দুনিয়াবিমুখতা, সংস্কারকর্ম, গ্রন্থরচনা এবং সৎ ও অসৎ কাজের আদেশ-নিষেধের বেলায় তিনি ছিলেন সমকালের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন পাঠদান ও ফতোয়া প্রদানের যোগ্য ব্যক্তিরূপে; অথচ তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। এই বয়সেই তিনি তাফসির, উসুল-সহ ইসলামি জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল শাখায় সমকালীন সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাফসির শাস্ত্রে তিনি ছিলেন এক বিরল প্রতিভা। ফিকহ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। অনেকে তাকে মুজতাহিদে মুতলাক[৩] বলেছেন। ইবনু তাইমিয়ার সময়ে হাদিস লিপিবদ্ধের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলেও মুখস্থ হাদিস বর্ণনার রেওয়াজ তখনো বাকি ছিল। অসংখ্য হাদিস ছিল তার মুখস্থ। সূত্র ধরে তিনি মুখস্থ হাদিস বলা শুরু

---

[১] যারা সেসময় পাঠ দান করতেন দামেশকের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

[২] *ইবনু তাইমিয়া : হায়াতুহু ও আসরুহু*, পৃষ্ঠা : ২৯

[৩] যার মধ্যে ইজতিহাদ ও গবেষণার সকল শর্ত বিদ্যমান, ফিকহের সব বিষয়ে যিনি ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, তাকে মুজতাহিদে মুতলাক বলা হয়। [দেখুন, *আদাবুল মুফতি*, ইবনুস সালাহ, পৃষ্ঠা : ২৩; *আল-মুস্তাসফা*, গাযালি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৫]

করলে বড় বড় হাদিস বিশারদও অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ওই সময়ের ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যেও তার কোনো তুলনা ছিল না।

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থাশীল। তিনি সবসময় আল্লাহর জিকির করতেন। তবে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে নির্দিষ্ট কিছু জিকিরও করতেন। তার যোগ্য শিষ্য ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহর কাছে গিয়ে দেখি, ফজরের সালাত শেষ করে তিনি জিকির করছেন। তাকে জিকিরমগ্ন দেখে আমি অপেক্ষা করতে থাকি। দুপুরবেলা জিকির শেষ হলে, আমার দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের মতো করে বলেন, এটা আমার সকালের 'আহার' বিশেষ। এই আহার গ্রহণ না করলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি।[১]

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'অনেক সময় এমন হতো, একটি আয়াতের ১শ'টি তাফসির জানার পরও মনের কোণে খটকা থেকে যেত। তখন আমি কোনো মসজিদ কিংবা নির্জন কোনো স্থানে চলে যেতাম। এরপর সঠিক তাফসিরটি জানার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতাম। শান্ত-সমাহিত মাটিতে কপাল ঠুকে বলতাম, প্রিয় আদম ও ইবরাহিমের শিক্ষক! আমাকে শিক্ষা দিন।'[২]

শাইখুল ইসলামের কৃতি ছাত্র হাফিজুল হাদিস ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শাইখ তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়া বড় হয়েছেন তাকওয়া, ইখলাস, ইবাদত এবং সততা ও সচ্চরিত্রতা চর্চার মধ্য দিয়ে। পোশাক ও খাবার গ্রহণে মিতব্যয়িতা ছিল তার স্বভাবগুণ। শৈশব থেকেই তিনি বিভিন্ন মজলিস ও দারসে উপস্থিত হতেন। বড়দের সাথে ইলমি বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। তার বক্তব্য শুনে শাস্ত্রীয় ব্যক্তিবর্গও হতবাক হয়ে যেতেন।'

জ্ঞান আহরণের অদম্য নেশা

শাইখুল ইসলামের ছিল নতুন কিছু জানার ও জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার অদম্য নেশা। অহর্নিশ গবেষণা তার মাঝে ক্লান্তির ছাপ ফেলতে পারত না। সামান্য সময়ের জন্য জ্ঞানার্জন থেকে নিবৃত হতেন না। কোনো প্রতিবন্ধকতা তার ও জ্ঞানার্জনের মাঝে দেয়াল তুলতে পারেনি। সিরিয়া ও মিশরের জেলে তাকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়। জেলজীবনও তাকে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান সাধনা তার রক্তমাংস ও শ্বাসপ্রশ্বাসে পরিণত হয়। ফলে তাকে জ্ঞান সাধনা থেকে কেউ নিবৃত করতে চাইলে বা তার থেকে কিতাবাদি ও খাতাকলম কেড়ে

[১] আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব, ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ১০৮

[২] আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ, ইবনু আব্দিল হাদি, পৃষ্ঠা : ৪২

নেওয়া হলে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, ব্যথায় কাতর হয়ে উঠতেন। দামেশকের বন্দিখানায় তার কাছ থেকে কিতাবাদি ও খাতাকলম কেড়ে নেওয়া হলে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এটাই তার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তিতে পরিণত হয়।

জ্ঞান সাধনার সময় তার তনুমনে অপার্থিব তৃপ্তিরা খেলা করত। এ তৃপ্তির কাছে দুনিয়ার যাবতীয় স্বাদ-আহ্লাদ ছিল নস্যি। তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে জ্ঞান-সাধনার তৃপ্তি সবচেয়ে বড় তৃপ্তি। এ তৃপ্তির রেশ রয়ে যায় মৃত্যুর পরও। কিয়ামতের দিন আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান এবং তাঁর জন্য আমল তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান তাকে উতরে দেবে।'[১]

শাইখুল ইসলামের জ্ঞান-সাধনার নেশা ও জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে জীবনীকারগণ যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। সাফাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি ছোটবেলা থেকেই জ্ঞানার্জনের প্রতি লোভাতুর ছিলেন। জ্ঞান-সাধনায় ছিলেন প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী। কোনো স্বাদ-আহ্লাদ তাকে জ্ঞানার্জন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে ইলমের তৃপ্তিতে হারিয়ে যেতেন। কখনো কোনো খাবার চাইতেন না; তার সামনে কেউ খাবার রেখে গেলে খেতেন। সকাল ও রাতের খাবারের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না।[২]

আবু হাফস আল-বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞান যেন তার রক্তমাংস তথা গোটা সত্তায় মিশে গিয়েছিল।'[৩]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সরাসরি আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়ার মুখ থেকে এ ঘটনা শুনেছি। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার তাকে পরামর্শ দেয়, জ্ঞানার্জন, গবেষণা, অধ্যয়ন ও অতিরিক্ত জিকির-আজকার থেকে আপনাকে কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হবে।

তিনি ডাক্তারকে বলেন, 'আপনারা কি বলেন না যে, মন যখন শক্তিশালী ও প্রফুল্ল থাকে, তখন রোগীর অবস্থা ভালো থাকে এবং অসুখ-বিসুখ সেরে যায়? দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা কি সুস্থতার শত্রু নয়?'

ডাক্তার বলেন, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমরা এমনটাই বলে থাকি।'

তিনি বলেন, 'যখন আমি অধ্যয়নে ডুবে থাকি, জ্ঞান-সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখি, জিকির-আজকারে নিজেকে ব্যস্ত রাখি এবং কঠিন জিনিস উদ্ধার করতে

[১] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৬২

[২] আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত, সাফাদি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯-২২

[৩] আল-আলামুল আলিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ১৮

সক্ষম হই, তখন আমার মন প্রফুল্ল থাকে। আর মন প্রফুল্ল থাকলে এবং মনে শক্তি সঞ্চার হলে আমি সুস্থ হয়ে উঠব, ইনশাআল্লাহ।'[১]

হাফিজুল হাদিস বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে একাধিকজন বলেছেন, তারা কখনো ইবনু তাইমিয়াকে খাবার চাইতে দেখেননি বা শুনেননি; সকালের খাবারও নয় রাতের খাবারও নয়। তিনি সর্বদা জ্ঞান-সাধনা ও আমলে অবগাহন করতেন। ফলে খাবার-দাবারের কথা মনে পড়ত না। তার কাছে খাবার রেখে দেওয়া হতো। অনেক সময় দেখা যেত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়িয়ে যাচ্ছে অথচ তার পাশে যে খাবার রাখা আছে, তিনি তা খেয়ালই করেননি। আর খেলে খুবই অল্প পরিমাণ খেতেন।[২]

শাইখুল ইসলামের ইলমি শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

মোটকথা ইলমের প্রায় সকল শাখায় তিনি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। নিজের রচনা ও বক্তৃতায় প্রতিটি শাস্ত্রকে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে নতুন গতি ও মাত্রা যোগ করেন। ফলে তার সমকালীন আলিম ও শাইখগণও তার প্রশংসা করতে বাধ্য হন, তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেন। ইবনুয যামলাকানি বলেন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া যখন কোনো বিষয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনা করতেন, তখন দর্শক-শ্রোতাদের মনে হতো, তিনিই এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন; এ বিষয়ে তার জুড়ি মেলা ভার! হানাফি-শাফিয়ি-নির্বিশেষে অন্য মাজহাবের ফকিহরাও সান্নিধ্যে এলে নিজেদের মাজহাব সম্পর্কে নানা তথ্য ও তত্ত্ব জেনে উপকৃত হতেন। ইলমি বিতর্কে লিপ্ত হয়ে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছেন, এমন কথা কারও জানা নেই। ধর্মীয় কিংবা জাগতিক; জ্ঞানের যেকোনো বিষয়েই তিনি কথা বললে, তার কথার স্থান হতো সবার ওপরে। ইজতিহাদের প্রতিটি শর্তের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল তার মাঝে।[৩]

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলামের জীবন ও কর্মের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য বা মূল্যায়ন পেশ করার যোগ্যতা আমার নেই। তার অবস্থান এরচেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। তবে আমি রুকনে ইয়ামানি[৪] ও মাকামে ইবরাহিমের[৫] মাঝখানে

---

[১] *মিফতাহু দারিস সাআদাহ,* ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭০-১৭১

[২] *আল-আলামুল আলিইয়াহ,* পৃষ্ঠা : ৫৫-৫৬

[৩] *আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ,* পৃষ্ঠা : ৭-৮

[৪] পবিত্র কাবার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি স্থান। এখানেই আছে হাজরে আসওয়াদ। ইয়েমেনের দিকে হওয়ায় এই কোণকে রুকনে ইয়ামানি বলা হয়।

[৫] মাকামে ইবরাহিম (ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর স্থান) হলো একটি পাথর, যা কাবা শরিফের পাশে চারদিকে লোহার বেষ্টনীর ভেতর একটি ক্রিস্টালের বাক্সে বিদ্যমান রয়েছে।

দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারব, আমি তার মতো আর কাউকে দেখিনি; তিনি নিজেও দেখেননি।[১]

শাইখ ইমাদুদ্দিন আল-ওয়াসিতি শাইখুল ইসলামের দীর্ঘ প্রশংসা করে বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের সময়কালে ইলমে, আমলে, চরিত্র-মাধুর্যে, চিন্তা-চেতনায় এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে তোমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়ার মতো আর কাউকে দেখা যায়নি। সমকালীন আলিমদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক সত্যান্বেষী, দূরদর্শী ও প্রতিবাদী। কোথাও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপেক্ষিত হতো দেখলে তিনি প্রচণ্ড রেগে যেতেন। শত্রুর ক্ষমতা কিংবা কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সবার আগে। হক প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। মানবীয় গুণের বিচারে, দানশীলতায় ছিলেন সবার চাইতে এগিয়ে। নবিজির পরিপূর্ণ অনুসরণকারী।[২]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর সাথে ইমাম ইবনু দাকিকিল ইদের সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'শাইখুল ইসলামকে কেমন দেখলেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, তার সামনে যেন যাবতীয় ইলমের পসরা সাজিয়ে রাখা হয়েছে; সেখান থেকে তিনি ইচ্ছেমতো গ্রহণ করছেন অথবা বর্জন করছেন।'[৩]

শাইখুল ইসলামের বাহ্যিক অবস্থাও তার দর্শক, শ্রোতা ও সাক্ষাৎপ্রার্থীর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলত। শাইখুল ইসলামের সমকালীন আলিম ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা দেওয়ার পরে বলেন, 'তার বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যের বাইরেও এগুলো এমন দৈহিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য, যা তার শ্রোতাদের মনে অন্যরকম প্রভাব ফেলে। তাই সবাই তাকে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নেয়।'[৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এমন একসময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন ইসলাম ভীষণ দুর্বল ও শতধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। খিলাফত হয়ে পড়েছিল নখদর্পহীন; প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমির-উমারা দুনিয়ার মোহ ও খ্যাতির জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে তাতাররা শহরের পর শহর বিরানভূমিতে পরিণত করেছিল, নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা করেছিল। একসময় ইউরোপিয়ানরা পাশ্চাত্য ছেড়ে সিরিয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিল। মিশর দখল করাই

[১] *শাযারাতুয যাহাব*, ইবনুল ইমাদ হাম্বলি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৮১-৮২

[২] *আত-তাযকিরাতু ওয়াল ইতিবার*, ইমাদুদ্দিন আল-ওয়াসিতি, পৃষ্ঠা : ৪৪

[৩] *যাইলু তবাকাতিল হানাবিলাহ*, ইবনু রজব হাম্বলি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯২

[৪] *ইবনু তাইমিয়া : হায়াতুহু ও আসরুহু*, পৃষ্ঠা : ২৯

ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। দামিয়েট্টার সমুদ্রবন্দরও দখল করে নিয়েছিল তারা। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে পুরো সিরিয়া ও মিশর চলে যেত তাদের দখলে।

শাইখুল ইসলাম তার সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে ছিলেন না; বরং সেইসব প্রেক্ষাপটে তিনি এক অনন্য মুজাহিদ আলিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। খোলা তরবারি হাতে তিনি জিহাদ করেছেন তাতারদের বিরুদ্ধে, কথায় ও কলমেও সে জিহাদ চলেছে সমানতালে।

পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও সামগ্রিকতা

আল্লাহ তাআলা তাকে প্রখর স্মৃতিশক্তি, মেধা, প্রবল জ্ঞানস্পৃহা এবং কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা দিয়েছিলেন। এই গুণগুলোকে কাজে লাগিয়ে তিনি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সমসাময়িককালে প্রচলিত বিভিন্ন শাস্ত্রে এতটা পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন যে, সেসময়ে তার চেয়ে বয়সে বড় এবং খ্যাতনামা উস্তাযরাও তার পাণ্ডিত্য দেখে অভিভূত হয়ে যেতেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়ে বলতেন, তিনি জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। ইসলামের চলন্ত গ্রন্থাগার। প্রতিটি শাস্ত্রেই তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। যে বিষয়েই তিনি কথা বলতেন, মনে হতো এ শাস্ত্রটি নিয়েই বোধ হয় তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করেছেন।

হাদিস শাস্ত্রে আল্লামা তাকিউদ্দিন ইবনু দাকিকিল ইদের মর্যাদা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। সে যুগের আলিমরা সবদিক থেকেই তাকে নিজেদের ইমাম ও মুরব্বি হিসেবে মান্য করতেন। ৭শ হিজরিতে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া মিশরে গেলে আল্লামা ইবনু দাকিকিল ইদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের পর আল্লামা তার মনোভাব জানান এভাবে—'ইবনু তাইমিয়ার সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হলো, তখন আমি অনুভব করলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাই তার নখদর্পণে; যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যেটি ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।'[১]

আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনুয যামলাকানি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম ও বহু শাস্ত্রের পণ্ডিত। তিনি ইবনু তাইমিয়ার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখায় যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তখন (অবলীলায় সে প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখে) দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে মনে হয় যেন, তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই শাস্ত্রে তার সমকক্ষ কেউ নেই।'[২]

---

[১] *আশ-শাহাদাতুয যাকিইয়াহ*, মারয়ি আল-কারমি, পৃষ্ঠা : ২৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৬

আল্লামা তাকিউদ্দিন ইবনুস সুবকি ছিলেন ইবনু তাইমিয়ার বিশেষ প্রতিপক্ষ। অনেক ফিকহি মাসআলায় তিনি ইবনু তাইমিয়ার মতামত খণ্ডন করে কিতাব পর্যন্ত লিখেছেন। কখনো-বা কবিতার মাধ্যমে তার সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। হাফিজ যাহাবিকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি শাইখুল ইসলামের ব্যাপারে বলেন—

'আমি অধম ভালো করেই জানি, ইবনু তাইমিয়া একজন মহিমান্বিত আলিম। শরিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এক অন্তহীন সমুদ্র! মেধা, শ্রম ও চিন্তার জগতে তার অবস্থান কত উঁচুতে সে ধারণাও আমার আছে! তাই অকুণ্ঠ চিত্তে বলছি, তার ইলমের গভীরতা ও সামগ্রিকতার প্রশংসা করাও কঠিন। আমি সবসময়ই তার বৈঠকে এ কথা স্বীকার করার সৎসাহস রাখি।'

ইতিহাস তার বিশেষ বিষয় ছিল না; ইতিহাসকে তিনি তার আলোচ্য বিষয়ও বানাননি। অথচ তা সত্ত্বেও ইমাম যাহাবির মতো খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও 'জীবনবৃত্তান্ত মূল্যায়ন শাস্ত্রের ইমাম' বলেন, 'ইতিহাস ও জীবনচরিত সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়ার জ্ঞান এককথায় বিস্ময়কর।'[১]

শাইখুল ইসলামের উস্তায

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল হাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলাম দুইশরও অধিক শাইখের কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন।[২] তাদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন—১. ইবনু আব্দিদ দায়িম। ২. ইবনু আবিল ইয়ুসর। ৩. শাইখ শামসুদ্দিন হাম্বলি। ৪. কাজি শামসুদ্দিন ইবনু আতা আল-হানাফি। ৫. শাইখ জামালুদ্দিন ইবনুস সাইরাফি। ৬. মাজদুদ্দিন ইবনু আসাকির। ৭. শাইখ জামালুদ্দিন আল-বাগদাদি। ৮. নাজিব ইবনু মিকদাদ। ৯. ইবনু আবিল খাইর। ১০. ইবনু আল্লান। ১১. ইবনু আবি বাকর আল-হারাবি। ১২. কামাল আব্দুর রহিম। ১৩. ফাখর আলি। ১৪. ইবনু শাইবান। ১৫. শারফ ইবনু কাউওয়াস প্রমুখ।[৩]

শাইখুল ইসলামের ছাত্র

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র অসংখ্য। তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো—

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৮-৫৯

[২] *আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ১৯

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৪২

১. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনি আব্দিল হাদি। ২. ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া। ৩. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনি উসমান আয-যাহাবি। ৪. মুহাম্মাদ ইবনু মুফলি আল-হাম্বলি। ৫. ইবনু কাসির। ৬. উমার ইবনু আলি আল-বাযযার। ৭. আহমাদ ইবনু হাসান ইবনি কুদামা। ৮. মুহাম্মাদ ইবনু শাকির আল-কুতবি। ৯. সুলাইমান আস-সারসারি। ১০. উমার ইবনু মুযাফফার ইবনি ওয়ারদি। ১১. মুহাম্মাদ ইবনু সাইয়িদিন নাস। ১২. ইউসুফ ইবনু আব্দির রহমান আল-কুযায়ি। ১৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনাজ্জা আত-তানুখি। ১৪. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ আল-বিরযালি। ১৫. সালাহুদ্দিন আস-সাফাদি প্রমুখ।[১]

[১] *মুজামু আসহাবি ইবনি তাইমিয়া*, ওয়ালিদ আল-উমাবি, পৃষ্ঠা : ২৮-১৯০

দাওয়াত ও অধ্যাপনা

ফতোয়া প্রদানের আসনে শাইখুল ইসলাম

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ অতি অল্প সময়ে সকল শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাফসির, ফিকহ, হাদিস, আকিদা, মানতিক-সহ অন্যান্য শাস্ত্র তার নখদর্পণে চলে আসে। ২০ বছরে পা দেওয়ার পূর্বেই তার পাণ্ডিত্যের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিশ বছর পূর্ণ করার পূর্বেই তাকে অনেকেই ফতোয়া প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, তারা তাকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। ফলে বিশের কোঠায় পা দেওয়ার পূর্বেই তিনি ফতোয়া প্রদানের আসনে সমাসীন হন। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ১৭ বছর বয়সে তিনি দারস-তাদরিসের যোগ্যতা অর্জন করেন।[১]

ইমাম যাহাবি আরও বলেন, ১৯ বছর বয়সে তিনি ফতোয়া প্রদান করতে শুরু করেন। তখন থেকেই তিনি লেখালেখিও অব্যাহত রাখেন এবং গভীর গবেষণায় নিজেকে সঁপে দেন।[২] ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দামেশকের কাজি আহমাদ ইবনু নিমাহ আল-মাকদিসি তাকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। সেই সময় তার বয়স ছিল প্রায় ১৯ বছর। তার মতো একজন বিদগ্ধ আলিমকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিতে পেরে তিনি গৌরববোধ করতেন এবং বলতেন, আমি ইবনু তাইমিয়াকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি প্রদান করেছি।[৩]

---

[১] *আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৪

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৪১

ফতোয়া প্রত্যাশীদের সাথে বিনম্র আচরণ

তার কাছে ফতোয়া জানতে চাইলে কিংবা কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না; বরং স্মিত হাসির সাথে স্বাগত জানাতেন। প্রশ্নকারীকে পর্যাপ্ত সময় দিতেন, সে নিজে থেকে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার প্রতিটি কথা পূর্ণ মনোযোগের সাথে শুনতেন। ছোটবড়, নারী-পুরুষ, দাস-স্বাধীন, আলিম-সাধারণ, উঁচুনিচু সবাইকে সমান গুরুত্ব দিতেন। অসৌজন্যমূলক কথা বলে কাউকে কখনো কষ্ট দিতেন না। যথাসম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতেন। তার কথাবার্তা এবং আচরণে সবসময়ই বিনয় প্রকাশ পেত।[১]

শাইখুল হাদিসের পদে শাইখুল ইসলাম

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ফতোয়া প্রদানের আসনে বসার কয়েক বছরের ব্যবধানে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। তার পিতা দামেশকের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় 'দারুল হাদিস সুক্কারিয়াহ'-এর শাইখুল হাদিস ছিলেন। তিনি ৬৬৭ হিজরি থেকে ৬৮২ হিজরি পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করার পর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ২১ বছর বয়সে এমন বড় প্রতিষ্ঠানের শাইখুল হাদিসের মতো বিরাট পদে নিয়োগ পান।

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ পদে নিয়োগ হওয়ার পর ৬৮৩ হিজরির ২রা মুহাররম সোমবার উদ্বোধনী দারস প্রদান করেন।[২] উদ্বোধনী দারসে সরকারী কর্মকর্তা, আলিম-উলামা-সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের অন্যতম, প্রধান বিচারপতি বাহাউদ্দিন ইবনু যাকি আশ-শাফিয়ি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব যাইনুদ্দিন আবু হাফস, শাফিয়ি মাজহাবের প্রধান শাইখ তাজুদ্দিন আল-ফাযারি, যাইনুদ্দিন ইবনু মুনাজ্জা হাম্বলি, কিছু হানাফি আলিম, ফকিহ ও জ্ঞানীগুণী।[৩]

তিনি উদ্বোধনী দারসে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। তার এ আলোচনা শুনে উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে যান। তাদের মাঝে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সবাই এক বাক্যে তার ইলমি শ্রেষ্ঠত্বের কথা মেনে নেন। সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শাইখ তাজুদ্দিন আল-ফাযারির মনে এ দারস এতটাই প্রভাব ফেলে যে, তিনি উক্ত দারস স্বহস্তে লিখে সুক্কারিয়াতে ঝুলিয়ে দেন।[৪]

---

[১] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, বাযযার, পৃষ্ঠা : ৪৮-৪৯

[২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩০৩

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩০৩; *আর-রাদ্দুল ওয়াফির*, পৃষ্ঠা : ১৫৫

শাইখুল ইসলামের দারস প্রদানের পদ্ধতি

হাফিজুল হাদিস বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যত দিন দামেশকে ছিলাম, তত দিন তার দারসে উপস্থিত থাকার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করিনি। তিনি দারসের জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতি নিতেন না। দুরাকাত সালাত আদায় করেই বসে যেতেন। তারপর এমন অভিনব শব্দমালায় হামদ ও দরুদ পাঠ করতেন, যা আমি অন্য কারও মুখে শুনিনি।

হামদ ও দরুদ শেষ করে পড়ানো শুরু করতেন। আল্লাহ যেন তার সামনে একে একে তুলে ধরতেন ইলমের নানান দিক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, আয়াত ও হাদিসের দলিল, আলিমগণের বক্তব্য, বক্তব্যের সমর্থনে আগত বক্তব্য, প্রতিটি বক্তব্যের যথাযথ ব্যাখ্যা, দুর্বল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের অসারতা, সেগুলোর খণ্ডন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কবির নাম-সহ কবিতা এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়। দারস শুরু হওয়ার পর আল্লাহর ইচ্ছায় তার মুখ থেকে বাধাহীন স্রোতের মতোই অনর্গল নিসৃত হতো থাকত অপার্থিব ব্যঞ্জনাময় শব্দমালা। তিনি সাগরের মতো নিজেকে উজাড় করে ইলমে নববি বিলিয়ে দিতেন।

আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কোনোরূপ চিন্তাভাবনা না করে নির্ভুলভাবে আলোচনা করতেন। আলোচনা শেষ করা পর্যন্ত যেন ঐশী ঝরনাধারা সকল শ্রোতা ও দর্শককে মোহাবিষ্ট করে রাখত। কিন্তু কথা শেষে যখন আমি তাকে দেখতাম, মনে হতো, অন্য কোনো কাজ শেষ করে মাত্রই যেন উপস্থিত হলেন। দারসের সময় তার মাঝে এক ধরনের গাম্ভীর্য প্রকাশ পেত, যা শ্রোতাদের দেহ, মন, শ্রবণ সবকিছু আচ্ছন্ন করে রাখত।

আলোচনায় আল্লাহর রাসুলের নাম এলেই তিনি দরুদ পাঠ করতেন। আল্লাহর শপথ! আমি নবিজির প্রতি তার চেয়ে অধিক শ্রদ্ধাশীল কাউকে দেখিনি। নবিজির অনুসরণে তার চেয়ে অধিক আগ্রহীও কাউকে দেখিনি। এমনকি কোনো মাসআলায় যদি নবিজির কোনো হাদিস পেতেন এবং অন্য কোনো নাসিখ (রহিতকারী) হাদিস না দেখতেন, তাহলে তিনি সেই হাদিসের দাবি অনুযায়ী আমল করতেন। সে অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। অন্যকারও বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

তিনি বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত প্রত্যেক বক্তাই তার বক্তব্য প্রমাণে দলিলের মুখাপেক্ষী।

দারস শেষ হলে তিনি চোখ মেলে সবার দিকে তাকাতেন। সবার চেহারাজুড়ে থাকত প্রফুল্লতা। মনে হতো, মাত্রই যেন সবার সাথে তার সাক্ষাৎ হলো।

আমি শাইখের দারসের যে বর্ণনা দিয়েছি, তা সবার মাঝে সুবিদিত। শাইখের দারসে যারা উপস্থিত হয়েছে, তারা সবাই এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবে। আল-হামদুলিল্লাহ, উপস্থিতদের সংখ্যাও হতো অগণিত। আলিম-উলামা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, কারি, মুহাদ্দিস, ফকিহ, সাহিত্যিক, জনসাধারণ; সকল শ্রেণির মানুষই তার দারসে উপস্থিত হতো।[১]

প্রথম তাফসির মজলিস

হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলামের প্রথম তাফসির মজলিস অনুষ্ঠিত হয় উমাইয়া মসজিদে। ১০ই সফর জুমআর সালাতের পর তিনি মিম্বারে বসেন এবং মুসলিম জনতার সামনে কুরআনুল কারিমের তাফসির পেশ করেন। সেই ছিল শুরু। এরপর আর কখনো ফিরে তাকাতে হয়নি। দিনদিন তার মজলিসের পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে তাফসিরের মান, বিষয়-বৈচিত্র্য ও জনসমাগম। তিনি তাফসির বর্ণনার সময় দ্বীনদারি, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, ইবাদত-সহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে আলোচনা করতেন। এসব কারণে তার তাফসির মজলিসের কথা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বছর ধরে তিনি বিভিন্ন স্থানে তাফসিরের মজলিস করেন।[২]

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বাবার মৃত্যুর পর শাইখুল ইসলাম তার স্থলাভিষিক্ত হন। কুরআনুল কারিমের নিয়মিত তাফসির শুরু করেন। তারই অংশ হিসেবে প্রতি জুমআয় মসজিদে তাফসির করতে থাকেন। তাফসির মজলিসে তিনি অবলীলায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ উদ্ধৃতি বলে যেতেন। সুরা নুহের তাফসির করতে তার কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল।[৩]

যেমন ছিল শাইখের তাফসির মজলিস

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জুমআর খুতবায় যে আয়াত তিলাওয়াত করা হতো, তাফসির মজলিসে সে আয়াতেরই তাফসির করতেন তিনি। মাত্র কয়েকটি আয়াতের তাফসির করতে করতেই মজলিসের সময় শেষ হয়ে যেত। তার মজলিসের জন্য দিনের এক-চতুর্থাংশ সময় নির্ধারিত ছিল। পুরো সময়জুড়ে তিনি একাই তাফসির করতেন। এজন্য তাকে বিশেষ প্রস্তুতিও নিতে হতো না। মজলিসে

---

[১] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, বাযযার, পৃষ্ঠা : ২৮-৩০

[২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩০৩

[৩] *আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৫

এসে তাৎক্ষণিক তাফসির শুরু করতেন।

অনেক সময় মজলিস শেষ হলে, শ্রোতাদের মনে হতো, হাতে সময় থাকলে তিনি হয়তো আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতেন। তার তাফসিরের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল এই যে, তিনি শ্রোতাদের জ্ঞান ও প্রয়োজন সামনে রেখে জীবনঘনিষ্ঠ আলোচনা করতেন।[১]

শুধু قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এর তাফসিরে তিনি বিশাল একটি কিতাব লিখিয়েছিলেন। الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى এর তাফসির লিখিয়েছিলেন ৩৫ পৃষ্ঠা। আমি জেনেছিলাম, তিনি তাফসির সংকলন শুরু করেছিলেন। সেই সংকলনটি শেষ হলে বইয়ের কলেবর হতো কমপক্ষে ৫০ খণ্ড।[২]

হাম্বলি মাদরাসায় দারস প্রদান

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার অন্যতম একজন শিক্ষক ছিলেন ফকিহ যাইনুদ্দিন ইবনু মুনাজ্জা হাম্বলি। তিনি তৎকালীন হাম্বলি মাজহাবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন আলিম ছিলেন। হাম্বলি মাজহাবের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি আল-মাদরাসাতুল হাম্বালিয়াতে দারস দিতেন। ৬৯৫ হিজরির শাবান মাসের ৪ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইবনু মুনাজ্জা ইন্তেকাল করলে সেই মাদরাসার দারস প্রদানের দায়িত্বও শাইখুল ইসলামের কাঁধে অর্পিত হয়। তার উস্তাযের ইন্তেকালের ১২ দিন পর ১৭ শাবান তিনি উক্ত মাদরাসায় দারস শুরু করেন। দারুল হাদিস সুক্কারিয়া এবং উমাইয়া মসজিদে দারস প্রদানের সাথে সাথে সেখানেও তিনি দারস প্রদান করতেন।

পরবর্তীতে তার অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়, সিরিয়া ও মিশরে প্রয়োজনের তাগিদে বারবার সফর করতে হয় এবং তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার পেছনে ব্যাপক সময় দেন। তিনি নিজেও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফলে আল-মাদরাসাতুল হাম্বালিয়াতে দারস প্রদান করার জন্য সময় বের করা তার জন্য সহজ ছিল না। তাই তিনি সেখানে দারস প্রদান বন্ধ করে দেন।[৩]

---

[১] আল-আলামুল আলিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ২৭-২৯

[২] আল-আলামুল আলিইয়াহ, বাযযার, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৪৪

তারসিম কারাগারে তিন পাদরির বিতর্ক

শাইখুল ইসলামের খাদেম শাইখ ইবরাহিম ইবনু আহমাদ আল-গিয়ানি বলেন, শাইখুল ইসলাম যখন তারসিম কারাগারে, সে সময়ের কথা। একদিন তার কাছে তিন পাদরি আসেন। ঈমান ও কুফর বিষয়ে তাদের মাঝে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। শাইখ দলিল-সহ প্রমাণ করে দেখান, তারা যে ধর্ম পালন করছে, তা ইবরাহিম এবং ঈসা আলাইহিমাস সালামের ধর্ম নয়।

তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, আমরা তো আপনাদের মতোই আমল করি। আপনারা যেমন নাফিসা বিনতু হাসানের কথা বলেন, আমরাও তেমন মা মারইয়ামের কথা বলি। তাছাড়া আমরা উভয় পক্ষই একমত যে, ঈসা ও মারইয়াম, হুসাইন ও নাফিসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনারা যেমন পূর্ববর্তী নেককার ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, আমরাও তেমন করি।[১]

তাদের কথা শুনে শাইখ বলেন, নাফিসা বিনতু হাসানের ব্যাপারে আপনারা যা দাবি করছেন, তার কোনো সুস্পষ্ট দলিলপ্রমাণ নেই। সবই সন্দেহপ্রসূত। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মে এগুলোর অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব। কারণ ইবরাহিমের দ্বীনের সারকথা ছিল, আমরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করব না। তাঁর কোনো শরিক নেই। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। এমনকি তাঁর কোনো সঙ্গিনী বা সন্তানও নেই। আমরা তাঁর সাথে কোনো রাজাবাদশা, চন্দ্রসূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র বা অন্য কিছু শরিক করি না। আমরা তাঁর সাথে কোনো নবি কিংবা ওলিকেও শরিক করি না—

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

---

[১] নাফিসা বিনতু হাসান ছিলেন হাসান ইবনু আলির পোপৌত্রী। অর্থাৎ হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে যাইদ, তার ছেলে হাসানের মেয়ে। তার মায়ের বংশও হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর আরেক সন্তান থেকে। বংশ মর্যাদা, ইলম, আমল ও পবিত্রতায় তিনি ছিলেন অনন্যা। ১৪৫ হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৩ হিজরিতে সপরিবারে হিজরত করে মিশরে আসেন।

ইমাম যাহাবি বলেন, 'নাফিসা বিনতু হাসানের প্রশংসায় অনেকে বাড়াবাড়ি করে। তার অনেক কারামত ও অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়। সেসব ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে মিশরের অনেকে তাকে সিজদা করত বলেও বর্ণিত আছে। তারা দুনিয়া-আখিরাতের আজাব থেকে বাঁচতে তার কাছে সাহায্য চাইত বলেও বর্ণিত আছে।' এসব কর্মকাণ্ড স্পষ্ট গাইরুল্লাহর উপাসনা। যা একজন মুমিনের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

'আপনারা যেমন নাফিসা বিনতু হাসানের কথা বলেন, আমরাও তেমন মা মারইয়ামের কথা বলি'—এ কথা বলে পাদরিরা বোঝাতে চেয়েছিল, মুসলিমরা যদি নাফিসা বিনতু হাসানকে সিজদা করে কাফির না হয়, তাহলে মারইয়াম ও ঈসাকে সিজদা করে তারা কেন কাফির হবে? [*সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১০৬]

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেকেই দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে।[১]

যেসব বিষয় কেবলই আল্লাহর কর্তৃত্ব ও এখতিয়ারে, সেগুলো অন্য কারও কাছে চাওয়া যায় না। যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ, উদ্ভিদ উৎপাদন, বিপদমুক্তি, সঠিক পথপ্রদর্শন, গুনাহ মাফ ইত্যাদি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এগুলো করা সম্ভব নয়। নবিদের আমরা বিশ্বাস করি, তাদের যথাযথ শ্রদ্ধা করি, তাদের অনুসরণ করি, তারা যা কিছু নিয়ে এসেছেন, আমরা তা সত্যায়ন করি এবং তাদের আনুগত্য করি—যেমনটি নুহ, সালিহ, হুদ ও শুআইব আলাইহিমুস সালাম বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং তাঁর আনুগত্য করো।' তারা ইবাদত ও তাকওয়া একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারণ করেছিলেন। আর তাদের আনুগত্য তো আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর।

কেউ যদি সকল নবির প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে; কিন্তু কেবল একজন নবিকে অস্বীকার করে, তবু সে মুমিন বলে গণ্য হবে না। অনুরূপ কেউ যদি সমস্ত আসমানি কিতাবে ঈমান আনা সত্ত্বেও কেবল একটি কিতাবকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, তাহলেও তার তথাকথিত ঈমান কোনো কাজে আসবে না। ফেরেশতা ও শেষ দিবসের বিষয়টিও এমনই।

শাইখুল ইসলামের বক্তব্য শুনে পাদরিরা বলে ওঠে, আপনি যে ধর্মের কথা বলেছেন, তা আমাদের পালিত ধর্মের চেয়েও উত্তম। এ কথা বলে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করে।[২]

শাইখুল ইসলামের উপস্থিত বুদ্ধি

আল্লামা সাফাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখ শামসুদ্দিন ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া রাহিমাহুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'বনু মুনাজ্জার সাথে একবার শাইখের কোনো বিষয়ে বিতর্ক হয়। আমি তখন খুব ছোট। মজলিসের এক কোণে বসে ছিলাম। শাইখুল ইসলাম যে বিষয় অস্বীকার করেছিলেন, ইবনু মুনাজ্জা সেই বিষয়েই ভুলভাল দলিল উপস্থাপন করছিল। শাইখ তাদের মূর্খতা দেখে ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। একপর্যায়ে হাতের কিতাবটি ছুড়ে ফেলেন। অমনি তারা বলে ওঠে—

আপনার তো ভারি দুঃসাহস! ইলমের কিতাব ছুড়ে ফেলছেন! তাদের আপত্তির উত্তরে তৎক্ষণাৎ তিনি বলে ওঠেন, 'আচ্ছা, বলো তো, কে উত্তম? আমি, নাকি

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৯৩

[২] *নাহিয়াতুম মিন হায়াতি শাইখিল ইসলাম*, ইবরাহিম আল-গিয়ানি, পৃষ্ঠা : ২৭

মুসা আলাইহিস সালাম?'

'মুসা আলাইহিস সালাম।'

'এই কিতাব কি মুসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া কাষ্ঠফলক থেকেও উত্তম?'

'না, নিশ্চয়ই ফলকগুলোই উত্তম।'

'মুসা আলাইহিস সালাম তো রাগের বশে তার হাতে থাকা ফলকগুলো ছুড়ে ফেলেছিলেন!'[১]

ইমাম সাফাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার এক ব্যক্তি শাইখুল ইসলামকে বলেন, আপনি তো মনে করেন, আপনার সব কাজ সুন্নাহ অনুযায়ী হয়! তাহলে আপনি যে মানুষের কান মলে দেন, তা কোন হাদিসে আছে? উত্তরে শাইখুল ইসলাম বলেন, হ্যাঁ, আছে। *সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমে* বর্ণিত একটি হাদিসে[২] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একরাতে আমি তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে দাঁড়াই। তখন তিনি আমার কানে ধরে পিছন থেকে এনে তার ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দেন।'[৩]

---

[১] *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬৩১৬; *সহিহ মুসলিম* : ৭৬৬

[৩] *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২

ভেতর-বাহির

পোশাক-পরিচ্ছদ

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। এত বেশি জমকালো পোশাক পরতেন না, যার কারণে মানুষ চোখ তুলে তাকিয়ে থাকবে। আবার এমন ছেঁড়া বা মোটা কাপড়ও পরতেন না, যার কারণে আর্থিক দৈন্য প্রকাশ পেয়ে যাবে। বরং তিনি মধ্যম মানের কাপড় পরিধান করতেন। নির্দিষ্ট কোনো পোশাকে তার বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। যখন যা পেতেন, তা-ই পরতেন। এভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে আলিম ও আবিদদের স্বতন্ত্র একটি আদর্শ তুলে ধরতেন।

সহজ কথায়, ঈমানের অনাড়ম্বরতা তার গায়ে লেগে থাকত। ওঠাবসা, চলাফেরা কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি মোটেই কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেন না। কাছের কিংবা দূরের; কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থীর জন্যই আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতেন না।[১]

বাযযার রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, তার পোশাকের ব্যাপারে কখনো এমন শোনা যায়নি যে, তিনি কোনো বিশেষ ধরনের পোশাক পরেছেন। তার পরিবারের লোকেরা যখন জানতে পারতেন, তার কাপড় প্রয়োজন, তখন তারাই নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করতেন। কখনো একই কাপড় দীর্ঘ সময় পরে থাকার কারণে ময়লা হয়ে যেত। কিন্তু সহজাত লাজুকতার কারণে মুখ ফুটে কাউকে ধুয়ে দেওয়ার কথা বলতে পারতেন না। তার পরিবারের লোকেরাই সময়মতো তার কাছ থেকে চেয়ে নিতেন।

---

[১] আল-আলামুল আলিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ৫১

শাইখুল ইসলামের যে ভাই তার বৈষয়িক বিষয়াদির তদারকি করতেন, তিনি বলেন, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে এই ছিল তার অভ্যাস।[১]

চারিত্রিক গুণাবলি

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে সব ধরনের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন; দাসীও গ্রহণ করেননি কোনোদিন। বৈষয়িক ব্যাপারে খুবই কম জানতেন। তার ভাই তার সমস্ত কাজ করে দিতেন। প্রায় দিনই তিনি সকালের ও রাতের খাবার গ্রহণ করতেন না। পৃথিবীতে আমি তার চেয়ে মহৎ ও সম্পদের লালসাহীন মানুষ আর দেখিনি। তিনি কখনো ধনসম্পদ নিয়ে আলোচনা করতেন না। আমার বিশ্বাস, তার মনের কোনো গহীন কোণেও কখনো সম্পদের চিন্তা তৈরি হয়নি।

তার মাঝে মানবতা ছিল; সৌজন্যবোধও ছিল। তিনি সঙ্গীসাথিদের সময় দিতেন। তাদের উপকার করার চেস্টা করতেন। অর্থের বিচারে তিনি ছিলেন হতদরিদ্র। পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল ফকিহদের মতো। ৩০ দিরহাম মূল্যের জুব্বা, দিলক[২] ও পাগড়ি পরিধান করতেন। পায়ের জুতাও ছিল স্বল্প মূল্যের। চুল সবসময় কেটে রাখতেন। সালাতে ইমামতি করলে, রুকু-সিজদা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করতেন। সৌজন্য সাক্ষাতের সময় হাসিমুখে সালাম-মুসাফাহা করতেন।

কেউ সফর থেকে ফিরলে কিংবা কারও সাথে দীর্ঘদিন পরে দেখা হলে, তার সম্মানে কখনো কখনো উঠে দাঁড়াতেন। তার দৃষ্টিতে সবাই ছিল সমান। তিনি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তাকে কোনোদিন কারও সামনে মাথানত করতে দেখা যায়নি।[৩]

মানবিকতা

শাইখ যাইনুদ্দিন আলি আল-ওয়াসিতি বলেন, আমি দীর্ঘ সময় শাইখুল ইসলামের কাছে অবস্থান করেছি। তখন দেখেছি, সকালে তিনি একটি থালায় করে নাস্তা নিয়ে আসতেন। আমরা দুজনে একসাথে খেতে বসতাম। তার খাওয়া শেষ হতো আমার বেশ আগেই। তবে খাওয়া শেষ করেই তিনি উঠে যেতেন না; থালাও তুলতেন না। আমি পরিতৃপ্ত হলে, তবেই থালা তুলে রাখতেন। আমি এত বেশি

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫২

[২] একসময়কার মিশরের আলিম, কাজি, সুফি-দরবেশগণের বিশেষ ধরনের পোশাক।

[৩] *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা*, ইবনু রজব, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

খেয়ে নিতাম যে, রাত পর্যন্ত আর খাওয়ার প্রয়োজন হতো না। আমার মনে হতো, শাইখের বরকতই ছিল এর প্রধান কারণ।

প্রতিদিন লোকেরা যেসব হাদিয়া নিয়ে আসত, তা সাদাকা করে দেওয়ার পর আমাদের দুজনের জন্য সামান্য পরিমাণই বাকি থাকত। রাতের খাবারের সময় দুয়েক লোকমা মুখে দিয়ে, বাকিটুকু আমাকে খেতে দিতেন। আমি অনুরোধ করলেও তিনি আর খেতেন না। এতে আমি মনে মনে কষ্ট পেতাম। আমি যত দিন তার কাছে ছিলাম, তত দিন অধিকাংশ সময় এই ছিল আমাদের অভ্যাস। সেই সময়ের চেয়ে নিজেকে আর কখনো এতটা স্বনির্ভর, একাগ্র আর মনোযোগী দেখিনি।[১]

বদান্যতা ও পরোপকারিতা

হাফিজ ইবনু ফাযলিল্লাহ আল-উমারি বলেন, তার কাছে রাশি রাশি সোনারুপা, ভালো ভালো ঘোড়া, উন্নত জাতের গবাদিপশু আর সুস্বাদু ফলমূল হাদিয়া আসত। তিনি সেগুলো অসহায় ও গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। নিজের জন্য তেমন কিছুই রাখতেন না। যেটুকু রাখতেন, সেটুকুও অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় হয়ে যেত।[২]

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, প্রতিবছর উপহার হিসেবে তার কাছে অঢেল সম্পদ আসত। তিনি সেসব নির্লিপ্তভাবে দান করে দিতেন। একটি দিরহামও জমিয়ে রাখতেন না; নিজের প্রয়োজনে কিছু ব্যয় করতেন না।

আল-আলামুল আলিইয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, শাইখুল ইসলাম অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখতেন, আলিম ও ফকিহদের মাঝে যারা অভাবগ্রস্ত কিংবা দুর্দশাপীড়িত, তাদের খুঁজে বের করে সাহায্য করতেন। সাধারণ কিংবা বিশেষ; সবার প্রয়োজনে সমানভাবে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন।[৩]

মারাকিল জিনান গ্রন্থের রচয়িতা ইবনুল মিরবাদ বলেন, 'সর্বকালের সেরা দাতাদের অন্যতম হলেন শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ। তার কাছে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন আসত। কিন্তু দিন শেষে দেখা যেত, গায়ে পরার পোশাকটি ছাড়া আর কিছুই তার কাছে নেই। সবকিছুই তিনি অভাবী ও দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। অন্যের প্রয়োজনের কথা শুনলে, নিজের প্রয়োজনের কথা ভুলে যেতেন। তাই কখনো তার ঘরে সম্পদ জমেনি। অভাবও ঘুচেনি। কিন্তু তার

[১] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৪৭

[২] *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ১৫৮

[৩] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৫৮

এই অভাব কখনো দানের পথে বাধা হয়েও দাঁড়াতে পারেনি।'

আল-আলামুল আলিইয়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাকে সৃষ্টিই করেছিলেন দানশীলতার গুণ দিয়ে। তিনি দান করতেন মনের আনন্দে; অকৃত্রিমভাবে। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি কখনো দিনার-দিরহাম সঞ্চয় করেননি। কোনোদিন নিজের সচ্ছলতার কথা ভাবেননি। যখনই কিছু হাতে এসেছে, নির্দ্বিধায় অন্যের হাতে তুলে দিয়েছেন। কেউ সাধ্যের ভেতর কিছু চাইলে, কখনো তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি।[১]

অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, কেউ তার কাছে টাকা চাইতে এসেছে, কিন্তু তার হাতে নগদ টাকা নেই। এই দুঃসময়েও তিনি প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। এক টুকরো কাপড় বা খাবার দিয়ে হলেও তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রয়োজন পূরণে ভূমিকা রেখেছেন। তার এই মহানুভবতা ছিল সর্বজনবিদিত।

শাইখ কারি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনি সাইদ বলেন, একদিন আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর মজলিসে বসে আছি। এমন সময় এক লোক এসে তাকে সালাম দেয়। তিনি লোকটিকে এক নজর দেখেই বুঝে ফেলেন, তার পাগড়ি প্রয়োজন। লোকটি মুখ ফুটে চাওয়ার আগেই তিনি মাথার পাগড়িটি খুলে দুই টুকরো করে ফেলেন। এক টুকরো নিজের মাথায় পরেন; আরেক টুকরো দিয়ে দেন আগন্তুককে। উপস্থিত সবাই তখন তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু চক্ষুলজ্জা বা সংকোচ তার বদান্যতার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।[২]

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী লোকেরা কেউ কেউ ভেবেছে, শাইখুল ইসলামের পাগড়ি দানের এই ঘটনাটি এক ধরনের অপচয়, অতি উদারতা। কিন্তু বিষয়টি আসলে তেমন নয়। কারণ সেসময় তার কাছে নিজের পরনের কাপড়টুকু ছাড়া অন্যকিছু ছিল না। তিনি ভেবে দেখলেন, পাগড়ি ছাড়া অন্য কোনো কাপড় দুই ভাগ করতে গেলে, সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে; একমাত্র পাগড়িটাই ভাগ করার পরেও ব্যবহারযোগ্য থাকবে। তাই তিনি সেটাই দুই ভাগ করে একটি অংশ লোকটিকে দিয়ে দিলেন। আর আরেকটি অংশ নিজে ব্যবহার করলেন। এতে পাগড়িরও উত্তম ব্যবহার হলো; আবার মুসলিম ভাইকে সহযোগিতাও করা হলো।[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৯

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬০

তাছাড়া হাদিসেও এমন দানের ঘটনা আছে। একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল ঝালরযুক্ত একটি চাদর পরে মসজিদে আসেন। মসজিদে তখন একদল সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি নবিজির চাদরটি দেখে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! চাদরটি আমাকে দিয়ে দিন। নবিজির কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। লোকটিকেও খালি হাতে ফেরাননি। নিজের গায়ের চাদরটি খুলে তার হাতে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন লোকটিকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। কারণ নবিজির পরনে তখন লুঙ্গি ছাড়া আর কোনো পোশাক ছিল না। চাদরটি তখন নবিজির নিজেরই প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ওই সাহাবিও জানতেন, নবিজি কাউকে বিমুখ করেন না। সাহাবিদের আপত্তির মুখে তিনি বলেন, আমি গায়ে পরার জন্য চাদরটি চাইনি; চেয়েছি যেন মৃত্যুর পর এই চাদরটিই আমার কাফন হিসেবে পরানো হয়। বর্ণনাকারী বলেন, 'এই চাদরেই তাকে কাফন পরানো হয়েছিল।'[১]

একদিন শাইখুল ইসলাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক অভাবী লোক তার কাছে হাত পাতে। গায়ের পোশাকটি ছাড়া তখন দেওয়ার মতো আর কিছু ছিল না। তাই গায়ের জামাটিই খুলে তাকে দিয়ে দেন। আর বলেন, এটা বিক্রি করে যা লাগে কিনে নিয়ো; নগদ অর্থ দিতে পারলাম না ভাই, মাফ করে দিয়ো।[২]

বীরত্ব ও চিন্তার দৃঢ়তা

ইবনু তাইমিয়ার বীরত্ব, সাহসিকতা ও তেজি মনোভাব সাধারণ মানুষদের জন্য তো বটেই; তুর্কি সেনাপ্রধান এবং ফৌজি অফিসারদের জন্যও ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে তিনি যে পরিমাণ নির্ভীকতা ও পৌরুষত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা দেখে সে যুগের বিখ্যাত সব তুর্কি সেনারাও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাফিজ সিরাজুদ্দিনের ভাষায়, 'তিনি ঘোড়ায় চড়ে নির্ভীক বীরের মতো ময়দানে প্রবেশ করতেন। রণাঙ্গনে দাঁড়াতেন দৃঢ়পদ অশ্বারোহীর মতো। শত্রুর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলতেন। এমন বেপরোয়াভাবে শত্রুসারির ভেতর ঢুকে পড়তেন যে, দেখে মনে হতো তার ভেতর মৃত্যুভয় বলে কিছু নেই।'[৩]

অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা শাসকদের মোকাবেলায় তিনি যে অবদান রেখেছেন, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং এ কথা বলার কারণ হলো তাকে যেন আমরা সঠিকভাবে চিনতে পারি। তিনি একাধারে তরবারির যুদ্ধ

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২০৯৩

[২] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৬১

[৩] *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ১৬১

থেকে শুরু করে কলমের যুদ্ধ, সবখানেই সমানতালে বীরত্ব দেখিয়েছেন। যেমন, বেশ কিছু মাসআলায় তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন, তিনি একাই যে সেগুলোর অবতারণা করেছিলেন তা কিন্তু নয়। বরং সেসব নিয়ে আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে, এমনকি বইপুস্তকও লেখা হয়েছে। তাছাড়া তার যুগে আরও অনেকেই তার মতো প্রচলিত মত থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি যেমন স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্ত কণ্ঠে নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন এবং লেখালেখি ও বক্তৃতায় অবলীলায় তুলে ধরেছেন, তেমনটি আর কেউ করেননি। এই সাহসিকতাই তার ব্যক্তিত্বকে অন্যদের চাইতে আলাদা করে তুলেছিল।

বিশুদ্ধ তাওহিদের ব্যাখ্যা, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াসংক্রান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন, তৎকালীন বিদআত ও গর্হিত কর্মকাণ্ড-সহ তাসাউফের লেবাসধারী বিদআতিদের প্রতারণা উন্মোচনে যে বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা এককথায় অসাধারণ ও মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। যেসব মাসআলার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তিনি সহিহ মনে করতেন, সেসব দলিলপ্রমাণ সহকারে জোরালোভাবে উপস্থাপন করতেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি নিজস্ব চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও উপস্থাপিত দলিলপ্রমাণে দৃঢ় থেকেছেন। এজন্য সীমাহীন কষ্টও ভোগ করেছেন। এই দিকটাতে লক্ষ করলে, তার কেবল বীরত্ব ও দৃঢ়তাই নয়; উচ্চ মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ মেলে। ইমাম যাহাবি তার জ্ঞানচর্চা, বীরত্ব এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তার যে সপ্রশংস চিত্র এঁকেছেন, সেখানেও আমাদের এই অভিমতের পক্ষে সমর্থন মিলবে—

তিনি তার অধ্যয়নকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এমন সব টীকা ব্যবহার করেছেন যা পূর্ববর্তী ও শেষ যুগের বিজ্ঞ আলিমগণ ব্যবহার করতে সাহস করেননি। ফলে মিশর ও সিরিয়ার দুয়েকজন আলিম ব্যতীত সবাই তার বিরোধী হয়ে যান। তাকে প্রতিপক্ষ মনে করতে থাকেন। তার বিরোধিতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করেন। তারা তাকে বিদআতি হওয়ার অপবাদ দেন, তার সঙ্গে বিতর্কে নামেন এবং তাকে পত্র লিখে সতর্ক করেন। কিন্তু তিনি সর্বাবস্থায় নিজস্ব চিন্তাধারা ও আকিদা-বিশ্বাসে সুদৃঢ় থেকেছেন। কোনো ক্ষেত্রেই ছাড় দেননি। কাউকে বিশেষ খাতির করেননি; বরং সবসময় সেসব বিষয়ই তুলে ধরেছেন, যা নিজস্ব ইজতিহাদ ও চিন্তাভাবনায় উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

তার এই দৃঢ়তা ও অবিচলতা গোঁড়ামিপ্রসূত ছিল না; বরং এর পেছনে ছিল যুহদ, দূরদৃষ্টি এবং আল্লাহর নির্ধারিত বিধিবিধানের প্রতি সীমাহীন ভক্তিশ্রদ্ধা। তার ও তার সমসাময়িক বিরোধী মহলে বেশ বড় বড় বিতর্ক হয়েছে; সিরিয়া ও মিশরে বিরাট মোকাবেলা হয়েছে। বহুবার এমনও হয়েছে যে, সমস্ত দল-উপদল একদিকে; আর ইবনু তাইমিয়া একা একদিকে। এরপরও মহান আল্লাহ তাকে বিরোধীদের ওপর বিজয় দান করেছেন। তাদের

অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাদের কূটকৌশল থেকে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া তার সমসাময়িকদের ভেতর জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে অবধারিতভাবেই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন; এটা তার সমসাময়িক আলিমগণও স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে যে গুণটি অন্যদের চাইতে তাকে আলাদা করে তুলেছিল এবং ইতিহাসের পাতায় তাকে এক অসাধারণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল, তা কেবল তার পাণ্ডিত্যের কারণেই নয়; বরং তার চিন্তার দৃঢ়তা, অপূর্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও তার মুজতাহিদসুলভ রীতি-পদ্ধতি এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তার সমসাময়িক আলিমগণ যেসব বইপুস্তক পাঠ করতেন, তার পাঠের তালিকায়ও সেগুলো ছিল। তারপরেও তিনি তার জ্ঞানভান্ডার থেকে নিজস্ব একটি রাস্তা বের করে নিয়েছিলেন এবং খুব দ্রুতই প্রসিদ্ধ আসনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। তিনি সবকিছু কুরআন-হাদিস এবং যুক্তির নিরিখে দেখতেন। সবকিছু অধ্যয়ন করতেন সমালোচনার দৃষ্টিতে। সিবাওয়াইহর লেখা কালজয়ী গ্রন্থ *আল-কিতাব* তখনকার সকল আলিমেরই পাঠ্য তালিকায় ছিল। কিন্তু প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন না করায় তাদের কারও কাছেই এই গ্রন্থের ভুলত্রুটি ধরা পড়েনি। অথচ ইবনু তাইমিয়া যখন *আল-কিতাব* অধ্যয়ন করেন, তখন তিনি ৮০টি জায়গা চিহ্নিত করেন। সেখানে সিবওয়াইহ ভুল করেছেন।[১]

গ্রিক যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তার যুগের অধিকাংশ আলিম ও ফকিহ সংযত ছিলেন। এই সংযম ভেঙে যারাই তা অধ্যয়ন করেছেন, তারাই কমবেশি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়; যারা দর্শনশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় সমালোচক ও দর্শনের নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিফহাল ছিলেন, তাদেরও অনেকে এই প্রভাব এড়াতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তিনি তার সাধারণ কিছু গ্রন্থ তো বটেই; *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিনকেও* গ্রিক অধিবিদ্যা, নীতি ও দর্শনের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেননি। দর্শনের ঐতিহাসিকগণ তার বহু রচনায় গ্রিকদর্শনের ছায়াপাত লক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে ইবনু তাইমিয়া ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম। তিনি গ্রিকদর্শন বুঝেছেন, যুক্তিশাস্ত্রের অলিগলি চিনেছেন এবং এসবের ত্রুটি নিয়ে সরব হয়েছেন, কিন্তু কখনো এসবের সাথে সমঝোতা করেননি। তিনি *কিতাবুর রাদ্দি আলাল মানতিকিইয়িন* নামক বইয়ে গ্রিকদর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের সমস্যা ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো সমালোচকের দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন।

---

[১] *আশ-শাহাদাতুয যাকিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৩২

ফিকহ ও হাদিস-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধ গণ্ডি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেসব গণ্ডির বাইরে কেউ পা ফেলার সাহস করত না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া দৃষ্টির আড়ালে থাকা অমীমাংসিত এবং জটিল সব মাসআলা সম্পর্কে পুনরায় চিন্তাভাবনা শুরু করেন। স্বীয় ইজতিহাদ, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভীকভাবে জাতির আলিম ও সাধারণ শ্রেণির সামনে পেশ করেন। ইবনু তাইমিয়া কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সাহাবিদের অনুসৃত আদর্শের আলোকে ফতোয়া দিতে শুরু করেন।

তার জীবদ্দশায়ই হাফিজ যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার এই প্রচেষ্টা মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন—

কয়েক বছর যাবত তিনি চার মাজহাব থেকে নির্দিষ্ট কোনো মাজহাব অনুসারে ফতোয়া না দিয়ে বরং যে মাজহাবের দলিল-প্রমাণকে তিনি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন, সে মোতাবেক ফতোয়া দিচ্ছেন। তিনি নির্ভেজাল সুন্নাহ ও ইসলামের প্রথম যুগের বুজুর্গদের অনুসৃত পন্থায় এমন সব দলিল-প্রমাণ, প্রতিপাদ্য ও কার্যকারণ-সম্পর্ক উদ্ধার করেছেন, যেসব ক্ষেত্রে তিনি একক ও তুলনাহীন। তার পূর্বে আর কেউ এমন দলিলপ্রমাণ ও প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

এসব ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো তাকে একক ভূমিকায় দেখা যায়। তবে সবসময়ই যে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন, সেটা বলা যাবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ভুলের শিকারও হয়েছেন। আর ভুল করা মানুষের জন্য খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ ও অকপট ছিলেন। তিনি আত্মপূজা, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার আনুগত্য, আরামপ্রিয়তা অথবা কোনো সুবিধা ও উপযোগিতার জন্য কোনো ইমামের মত, কোনো ফিকহি মাজহাব অথবা জমহুরের মতামত পরিত্যাগ করে কোনো মাসআলার ইস্তিম্বাত (উদ্ভাবন) করতেন না।

তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী, দলিল-প্রমাণের ভক্ত এবং কুরআন সুন্নাহর অনুগত। এ সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন, পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমরা এখানে তা তুলে ধরছি। তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠতম বুজুর্গ ছিলেন। যেসব ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলোও তিনি নিজের খেয়ালখুশির বশবর্তী হয়ে করেননি। সাধারণত যখন তিনি কোনো ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে আশ্বস্ত হতেন, তখনই কেবল তার ওপর অটল থাকতেন। যেসব মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেসব মাসআলার ক্ষেত্রে আমাদের তার অনুসরণ করা উচিত, তা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত এবং তার জন্য কল্যাণের দুআ করা উচিত। আর যেসব মাসআলায় তার ভুল হয়েছে, সেসব

ক্ষেত্রে আমাদের উচিত তার অনুসরণ না করা। এ ব্যাপারে তিনি ক্ষমার্হ, কারণ তার যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমগণ অকপটে স্বীকার করেছেন, তার মধ্যে ইজতিহাদের সব শর্তই বিদ্যমান ছিল। এমনকি তার একজন বড় প্রতিপক্ষ, যিনি তাকে হেনস্তা করার জন্য সবসময় তৈরি থাকতেন, সেই শাইখ জামালুদ্দিন আয-যামলাকানিও তার এই অনন্য যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।'[১]

নিষ্ঠা ও নিবিষ্টচিত্ততা

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর জীবনের উজ্জ্বলতম দিকটি হলো, তিনি সবসময় দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামের জন্য নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। সারাজীবনে আর কোনোকিছুর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করেননি। তার সমসাময়িক অনেক নামকরা আলিম ও মনীষী ছিলেন, যারা ইলমের সুমিষ্ট স্বাদ গ্রহণের পরেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হয়েছেন, রাজাবাদশাদের উপহার-উপঢৌকন কিংবা সরকারি ভাতার বিনিময়ে কেউ কেউ দ্বীনের সাথে সমঝোতা করেছেন, কেউ-বা দুনিয়াবি কিছু সুবিধা হাসিল করেছেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়া গোটা জীবন খুব সাবধানে নিজেকে এসব থেকে দূরে রেখেছিলেন। তার মতো নির্মোহ আর দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষ পৃথিবীর বুকে দুর্লভ। ইলম ও দ্বীনের চর্চা, অধ্যয়ন ও শিক্ষকতা, গ্রন্থপ্রণয়ন ও গবেষণা এবং ফতোয়া প্রদান ও ওয়াজ-নসিহত ছাড়া আর কোনো পেশার সাথেই তিনি নিজেকে জড়াননি।

আল-কাওয়াকিবুদ দুররিইয়ার লেখক বিশ্বস্ত লোকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—

'তিনি পুরো জীবন মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে কাটিয়ে দিয়েছেন। কখনো এমন কোনো পেশা অবলম্বন করেননি, যা তাকে আল্লাহর ধ্যান ও জ্ঞান থেকে অন্যমনস্ক করে দেবে। এজন্য বিয়ে কিংবা উপার্জনমূলক কোনো কাজেও কখনো সময় দেননি। দ্বীন ও উম্মতের চিন্তা তাকে এত ব্যস্ত করে রেখেছিল যে নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশটুকুও পাননি। সারাজীবন একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞানের অনুসন্ধান ও জিহাদি কর্মকাণ্ডে কাটিয়ে দিয়েছেন।'[২]

ইলম বা জ্ঞানকে যদি কোনো মুদাররিস কিংবা মুফতির সাময়িক পেশা ও খেদমতের বিষয় হিসেবে দেখা হয়, তবে বলতে হয়, ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর ক্ষেত্রে তা যেন আত্মার খোরাক ও নিত্যদিনের পোশাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায়, ইলম তার জীবনের একটি সহজাত স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শাইখ সিরাজুদ্দিন

---

[১] *আশ-শাহাদাতুয যাকিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৭৩

[২] *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৮৪

আবু হাফস আল বাযযার বলেন, 'তাকে দেখলে মনে হতো, শুধু শিরা-উপশিরা নয়; বরং তার শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকাতে যেন ইসলামের জ্ঞান বয়ে চলেছে। ইলম তার কাছে সাময়িক কোনো চাহিদা বা প্রয়োজন মেটানোর বিষয় ছিল না; বরং তার অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল।'[১]

ধৈর্যশক্তি

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ একটি চিঠিতে তার এক ছাত্রকে লেখেন, আমি ভালো আছি। চোখদুটোও আগের চেয়ে ভালো। আমরা তো সবসময়ই আল্লাহ তাআলার অজস্র নিয়ামতে ডুবে থাকি। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ যে ফয়সালা করেন, তাতেই রহমত ও হিকমাহ রয়েছে। নিশ্চয় আমার রব যা চান, তা সুকৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আসলে মানুষ নিজের গুনাহের কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۖ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ... ﴿٧٩﴾

আপনি যে কল্যাণ লাভ করেন, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, তা হয় আপনার নিজের কারণে।[২]

তাই বান্দার দায়িত্ব হলো, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা; সকল পরিস্থিতিতে তাঁর প্রশংসা করা, নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকা। শুকরিয়া নিয়ামতকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ইস্তিগফার আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ মুমিনের জন্য যে ফয়সালাই করেন, তাতেই মুমিনের জন্য কল্যাণ থাকে। কোনো মুমিন তাই পছন্দনীয় কোনোকিছু লাভ করলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। আর বিপদে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করে। আর সেই সবরই তখন তার জন্য কল্যাণকর হয়।[৩]

অন্যের প্রশংসায় তার প্রতিক্রিয়া

শাইখুল ইসলামের সামনে কেউ তার প্রশংসা করলে, তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম, সত্যি বলছি, আমি প্রতি মুহূর্তে আমার ইসলামকে ঘষেমেজে ঠিক করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখনো আমি পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে উঠতে পারিনি।

---

[১] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৩৫

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ৭৯

[৩] *আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৩৬৬-৩৬৭

সরকারি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

সালাফগণ ছিলেন প্রচারবিমুখ। তারা সবসময় দায়িত্ব বিশেষ করে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ওপর কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কারণে অনেকে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেককে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাসের পর মাস বছরের পর বছর দিনাতিপাত করতে হয়েছে। এমনকি অনেককে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে। সরকারি দায়িত্ব গ্রহণে তাদের এমন অনীহার পেছনে অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতার অভাব এবং সরকারের তোষামোদি করার প্রবণতা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহও জ্ঞান, আমল-আখলাক ও নীতি-আদর্শে সালাফদের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। ৬৯০ হিজরির পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে তাকে বিচারপতি ও হাম্বলি মাজহাবের প্রধান শাইখের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[১]

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৭৩

শাইখুল ইসলামের রাতদিন

ইবাদত

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলামের মতো ইবাদতের কথা খুব কমই শোনা যায়। তিনি দিনরাতের বেশিরভাগ সময় ইবাদত-বন্দেগিতেই কাটিয়ে দিতেন। তার এই নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত-বন্দেগিতে যেন কোনো ছেদ না-ঘটে, সেজন্যই তিনি অর্থ উপার্জনমূলক কোনো পেশা গ্রহণ করেননি; এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কেও আবদ্ধ হননি। কারণ এগুলো অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে।

সারা রাত নির্জনে তিনি রবের ইবাদত করতেন। রবের ভয়ে তার দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ত। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি সমস্ত কষ্ট থেকে সান্ত্বনা খুঁজতেন। জিকির ও আল্লাহর ধ্যানে হারিয়ে যেতেন, তাকে দেখে তখন মনে হতো যেন জগৎসংসারের কোনো কিছুর সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। ভোরে ফজরের সালাতে মানুষের সাথে দেখা হতো। সুন্নাত সালাত ঘরেই পড়ে আসতেন। তার তাকবির শুনলে নির্জীব হৃদয়েও আল্লাহর ভয় জাগ্রত হতো। সালাতের পুরো সময় জুড়ে তার শরীর কাঁপতে থাকত। কাঁপতে কাঁপতে কখনো দুপাশে একটু হেলে পড়তেন।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে টেনে টেনে কিরাত পড়তেন।[১] শাইখুল ইসলামও ঠিক তা-ই করতেন। রুকু-সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসতেন। প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করতেন। প্রথম সালাম ফেরাতেন

[১] *সুনানুন নাসায়ি* : ১০১৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৫৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩০০২; হাদিসটি সহিহ।

উচ্চশব্দে। উপস্থিত সবাই সালামের শব্দ শুনতে পেত। সালাত শেষে সবাই হাদিসে বর্ণিত এই দুআটি পাঠ করতেন—

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

আল্ল-হুম্মা আংতাস সালা-মু ওয়া মিংকাস সালা-ম। তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌র-ম।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি শান্তিময়; আপনার কাছ থেকেই শান্তির আগমন ঘটে। হে মহামহিম ও মহানুভব! আপনি বড়ই প্রাচুর্যময়।[১]

তারপর মুসল্লিদের দিকে ফিরে মাসনুন দুআ পাঠ করতেন। ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং ১ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করতেন। যেমনটি হাদিসে এসেছে।[২] মুসল্লিরাও তার সাথে শরিক হতেন এই জিকিরে। তারপর নিজের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য দুআ করতেন।

দুআ করতে গেলে প্রায় সময়ই তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করবেন না। আমাদের পক্ষে কৌশল অবলম্বন করুন, আমাদের বিরুদ্ধে কৌশল করবেন না। আমাদের হিদায়াত দান করুন, হিদায়াতকে আমাদের জন্য সহজ করুন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ করুন, আপনার স্মরণে মগ্ন ও অবনত রাখুন। হে রব, আমাদের তাওবা কবুল করুন, আমাদের পাপ মাফ করে দিন, আমাদের দলিলগুলো সুসাব্যস্ত করুন, আমাদের হৃদয়ে হিদায়াতের আলো জ্বালিয়ে দিন এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে আমাদের হৃদয়কে মুক্ত রাখুন।'

দরুদ পাঠের মাধ্যমে দুআ শুরু করতেন, দরুদের মাধ্যমেই শেষ করতেন। তারপর জিকির শুরু করতেন। জিকিরের সময় তার স্বর সবসময় নিচু থাকত। আশেপাশের কেউ তার শব্দ শুনতে পেত না। কখনো বড়জোর তার একেবারে পাশে থাকা ব্যক্তি হয়তো অস্ফুট আওয়াজ শুনতে পেত। এ সময়টিতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তিনি কারও সাথে কথা বলতেন না। জিকিরের সময় বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। সূর্যোদয়ের পর হারাম সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এই ছিল তার আমল।[৩]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৫৯১

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৫৯৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৮৩৪

[৩] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৩৭-৩৮

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, দামেশকে অবস্থানকালে দিনরাতের অধিকাংশ সময় আমি তার সাথেই থাকতাম। তিনি আমাকে ডেকে কাছে বসাতেন। আমি তার জিকির ও তিলাওয়াত শুনতে পেতাম। আমি দেখতাম, তিনি বারবার সুরা ফাতিহা পড়তেন। ফজরের পর থেকে সূর্য ওপরে ওঠা পর্যন্ত তিনি অনেক সময় শুধু সুরা ফাতিহা পড়েই কাটিয়ে দিতেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, অন্য সব সুরা বাদ দিয়ে তিনি এই সুরাই কেন বারবার পড়েন? পরে আমার মনে হয়েছে, ফজরের পর মাসনুন দুআ পাঠ করা উত্তম নাকি তিলাওয়াত করা উত্তম; এই দুই অবস্থানের মাঝে সমন্বয় করতে গিয়েই তিনি হয়তো এমনটি করতেন।

তারপর যদি অন্য কোনো স্থানে হাদিস শুনতে চাইতেন, তাহলে তখনই বেরিয়ে পড়তেন। সঙ্গীসাথিরা কেউ তার দেখা পেলে, তারা শাইখের হাতে চুমু খেত, বড় বড় ব্যবসায়ীরাও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাকে সালাম করে আদবের সাথে কথা বলত। ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সবাইকে যথাযথ সময় দিতেন। রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে, নিজ হাতে সরিয়ে দিতেন।

কোথাও কারও জানাযার কথা জানতে পারলে, দ্রুত সেখানে উপস্থিত হতেন। আর জানাযায় যেতে না পারলে আফসোস করতেন। হাদিস শোনার পর তিনি চলে যেতেন কবরস্থানে, মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করতেন। তারপর আবার মসজিদে ফিরে এসে ফতোয়া প্রদান করতেন। সুযোগ পেলেই মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করতেন। এভাবে যুহর পর্যন্ত চলত। জামাতের সাথে যুহরের সালাত আদায় করতেন। তারপর বাকি দিন এভাবেই কেটে যেত।

নারীপুরুষ, ছোটবড়, স্বাধীন-পরাধীন সবাই অংশগ্রহণ করত তার মজলিসে। তার মজলিস ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। মজলিসে উপস্থিত সবাই মনে করত, শাইখ তাকেই বেশি সম্মান করেন।

সূর্য ডুবে যেত। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। মাগরিবের পর নফল সালাত পড়তেন। নফল সালাতের পর আমি তার নিজের কিতাব কিংবা অন্য কারও কিতাব পাঠ করে শোনাতাম। তিনি নানাভাবে আমাদের উপকার করতেন। ইশার পরও আমরা তার কাছে অবস্থান করতাম। সেসময় তিনি ইলমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেন। এভাবে অনেক রাত হয়ে যেত। কথার ফাঁকে ফাঁকেই দেখতাম, তিনি আল্লাহর জিকির ও ইস্তিগফার করছেন।

শাইখ অনেক সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমি যত দিন তার সান্নিধ্যে ছিলাম, এমনই করতে দেখেছি। হায়! তার সান্নিধ্যের সময়টা কত সংক্ষিপ্ত ছিল। আহ! সেই সময়টুকু যদি আরও দীর্ঘ হতো! আল্লাহর শপথ, তার সাথে

কাটানো সময়ের চেয়ে প্রিয় আর মূল্যবান সময় আমার জীবনে আর কখনোই আসেনি। সেসময়ে আমার দ্বীনি ও আত্মিক অবস্থা ছিল সবচেয়ে উত্তম পর্যায়ে। আমি মনে করি, শাইখের বরকতেই এমন হয়েছিল।

তিনি সপ্তাহে একবার রোগী দেখতে যেতেন। হাসপাতালে থাকা রোগীদের বিশেষ খোঁজখবর নিতেন।

আমি একাধিক নির্ভরযোগ্য লোক মারফত জেনেছি, তারাও শাইখকে আমার মতোই দেখেছেন। এরচেয়ে উত্তম ইবাদত আর সাধনা আর কী হতে পারে! চির পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর প্রিয় ও মনোনীত বান্দাদের এত অসাধারণ রূপে আমলের তাওফিক দান করেন।[১]

শাইখুল ইসলামের কাছে জিকিরের গুরুত্ব

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, মাছের কাছে পানি যেমন জরুরি, হৃদয়ের জন্য জিকিরও তেমন। পানি থেকে তুলে নিলে মাছের অবস্থা কেমন হয়?[২]

একবার আমি শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহর কাছে গিয়ে দেখি, ফজরের সালাত শেষ করে তিনি জিকির করছেন। তাকে জিকিরমগ্ন দেখে আমি অপেক্ষা করতে থাকি। তিনি ক্রমাগত জিকির করতেই থাকেন। দুপুরবেলা তার জিকির শেষ হলে আমার দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে বলেন, এটা আমার সকালের 'আহার' বিশেষ। এই আহার গ্রহণ না করলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি।

আরেকবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'নিজেকে বিশ্রাম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি শুধু জিকির ত্যাগ করি; যাতে সেই বিশ্রামের মাধ্যমে আমি আবারও জিকিরের জন্য শক্তি ফিরে পাই।'[৩]

ইমাম কুরাশি রাহিমাহুল্লাহ *তারিখু হাওয়াদিসিয যামানে* উল্লেখ করেন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া অধিক পরিমাণে জিকির করতেন। বেশি বেশি সালাত পড়তেন। নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। দিনরাতের পুরোটা সময়জুড়ে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি প্রায়ই এই জিকিরটি করতেন—

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯

[২] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ১০৮

[৩] প্রাগুক্ত

يَا حَيُّ ، يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ইয়া- হাইয়ু ইয়া- ক্বইয়ূমু বিরহ্‌মাতিকা আস্‌তাগীছু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা ইয়া- যাল্‌ জালা-লি ওয়াল্‌ ইক্‌র-ম।

অর্থ : হে চিরঞ্জীব, সমস্ত কিছুর ধারক, আপনার দয়ার অসিলায় সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই হে মহিমাময় ও মহানুভব।

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।[১]

তাকওয়া

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সারাজীবন তাকওয়ার সাথে কাজ করার তাওফিক দিয়েছিলেন। বেচাকেনা, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ কিংবা দালান-কোঠা করার জন্য তিনি মানুষের সাথে মেলামেশা করেননি। কোনো দিন ওয়াকফকৃত সম্পদের দিকে চোখ তুলেও তাকাননি। তিনি সুলতান, আমির কিংবা কোনো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোনো ভাতা গ্রহণ করেননি। কোনোদিন দিনার-দিরহাম কিংবা খাদ্যদ্রব্য জমিয়ে রাখেননি।

জীবদ্দশায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণই ছিল তার সম্বল, আর মৃত্যুর পরেও তার রেখে যাওয়া মিরাস যেন সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছিল যে, জীবনে কীভাবে আল্লাহর রাসুলকে অনুসরণ করতে হয়। ঠিক যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আলিমরা হলেন নবিদের উত্তরসূরি। নবিগণ মিরাস হিসেবে কখনো দিনার বা দিরহাম রেখে যান না; রেখে যান কেবল ইলম। সুতরাং যে ইলম গ্রহণ করেছে, সে তার প্রাপ্তি পূর্ণরূপে বুঝে পেয়েছে।'[২]

দুনিয়াবিমুখতা

যারা শাইখুল ইসলামকে দেখেছেন; বিশেষত যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য তার সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, তার মতো দুনিয়াবিমুখ মানুষ তারা কখনো দেখেননি। এক্ষেত্রে তিনি এতটাই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, কাছের-দূরের সবার মনে, দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি হিসেবে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। অনেক দূরদেশের

---

[১] *তারিখু হাওয়াদিসিয যামান*, কুরাশি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৯

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৪১; *জামিউত তিরমিযি* : ২৬৮২; হাদিসটি সহিহ।

সাধারণ কোনো লোকের কাছেও যদি প্রশ্ন করা হতো, এ যুগে সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ মানুষটি কে? কিংবা আখিরাত পাওয়ার আশায় দুনিয়ার সব সুযোগ-সুবিধাকে পায়ে ঠেলে দেবে, এমন কারও নাম জিজ্ঞেস করলে—সে নির্দ্বিধায় বলে দিত, ইবনু তাইমিয়া।

বিশুদ্ধ নিয়ত ও চূড়ান্ত দুনিয়াবিমুখতার কারণেই তিনি এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কেউ কোনোদিন এমনটি বলতে পারবে না যে, ইবনু তাইমিয়া সুন্দরী স্ত্রী, দাসী, অঢেল সম্পদ, বাড়িঘর, খেতখামার কিংবা মসৃণ পোশাকের প্রতি আগ্রহ বোধ করেছেন। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে একবারের জন্যও তিনি নেতৃত্বের প্রতি লালায়িত হননি; এমনকি দুনিয়াবি সম্পদের মধ্যে বৈধ কিছু অর্জনের জন্যও তাকে কখনো চেষ্টা করতে দেখা যায়নি। অথচ রাজাবাদশা, আমির-ওমারা, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী—সবাই ছিল তার আদেশের অনুগত, যেকোনো মূল্যে তার নৈকট্য লাভে প্রয়াসী।[১]

সালাত ও দুআর পূর্বে

ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলাম দরুদ ও সালাম পাঠের সময় যথাসম্ভব সাদাকা করতেন। কারণ হিসেবে বলতেন, নবিজির সাথে একান্তে কথা বলার আগে যেহেতু সাদাকা করা মুস্তাহাব, সেহেতু আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলার আগে সাদাকা করা মুস্তাহাব হওয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত।

অভূতপূর্ব বিনয়

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলামের সময়কালে তার মতো বিনয়ী মানুষ দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। তিনি ছোটবড়, ধনীগরিব, সবাইকেই সমান বিনয় দেখাতেন। সৎকর্মপরায়ণ দরিদ্র লোকদের একেবারে আপন করে নিতেন। তাদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলতেন। গরিব-দুখীদের সেবা করতেন। নিজের আমিত্ব ও অহমবোধকে মেটাতে অন্যের প্রয়োজনকে নিজের কাঁধে তুলে নিতেন, এভাবেই রবের নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করতেন।[২]

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহর সাথে বিনয়

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যে-সময়টুকু শাইখের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি, সেসময়ে তিনি আমার সাথে অত্যন্ত বিনয়পূর্ণ আচরণ করেছেন। তিনি আমার নাম ধরে পর্যন্ত ডাকতেন না; ডাকতেন নানা ধরনের সুন্দর উপাধিতে। আমার সাথিদের মাঝে আমার প্রতি তিনি বিশেষ সম্মান প্রকাশ করতেন। মজলিস দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত,

---

[১] আল-আলামুল আলিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৫

[২] আল-আলামুল আলিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৮

বিশেষ হোক কিংবা সাধারণ; আমাকে সবসময় তার পাশে বসাতেন। সহিহুল বুখারি পড়ার সময় তিনি আমার সাথেই থাকতেন। আমি ভেবেছিলাম, নির্দিষ্ট একজন শাইখের কাছে গোটা *সহিহুল বুখারি* একা একা পড়ে শেষ করব। আমার মনে হতো, আমি মানুষের উপস্থিতিতে পড়ার উপযুক্ত হইনি। তাছাড়া আমি চাইছিলাম, আমার হাতে অল্প যেটুকু সময় আছে, সেটুকুই কাজে লাগিয়ে দ্রুত পড়া শেষ করতে। কেননা আমার ভয় ছিল, না জানি আমি আমার শাইখকে হারিয়ে ফেলি। ঘটনাক্রমে শাইখুল ইসলাম আমার এই ইচ্ছে ও দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেন এবং একদিন এক বিশাল সমাবেশে আমাকে *বুখারি* পাঠ করতে বাধ্য করেন। তিনি বলেন, এমন গুণ অর্জন করা উচিত, যার উপকার সকল মুসলিম ভোগ করার সুযোগ পায়। সেদিন তিনি আমাকে সাহস যুগিয়েছিলেন বলেই আমি নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পাই। তার কথামতো সবার সামনেই *বুখারি* পড়তে শুরু করি এবং ধারাবাহিক ২০টি মজলিসে বুখারি পাঠ করে শুনাই।

শাইখুল ইসলাম আমার প্রতি সবসময় সুন্দর ব্যবহার করেছেন। কথায় ও কাজে বিনয় প্রকাশ করেছেন। হাদিস পাঠের জন্য যখন আমরা তার বাড়ি থেকে বের হতাম, তিনি নিজেই কিতাব বহন করতেন; আমাদের কাউকে নিতে দিতেন না। বেয়াদবির আশঙ্কায় আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতাম। তিনি বলতেন, আসলে এ কিতাবটি মাথায় বয়ে নেওয়া উচিত ছিল। যে কিতাবে নবিজির বাণী রয়েছে, সে কিতাব বহনের সৌভাগ্য থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত করব!

হাদিস পাঠের মজলিসে শাইখুল ইসলাম চেয়ারে না বসে, নিচে বসতেন। মজলিসের প্রধান আসন আমার জন্য ছেড়ে দিতেন। তাকে নিচে বসতে দেখে আমি খুব লজ্জা পেতাম; আবার এমন বিনয় ও অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শনে মুগ্ধও হতাম। আল্লাহর রাসুলের হাদিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপার না থাকলে, আমি কিছুতেই তাকে নিচে বসতে দিতাম না। এটা মোটেই সমীচীন হতো না। যারা শাইখের সান্নিধ্যে আসতেন অথবা তার সাথে যাদের সাক্ষাৎ হতো, তাদের সবার প্রতিই তার আচরণ ছিল এমনই উন্নত। যারাই শাইখের সান্নিধ্য লাভ করেছে, তারা সবাই শাইখের এমন অতুলনীয় বিনয়ের কথা বর্ণনা করেছেন।[১]

কারামত ও অন্তর্দৃষ্টি

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা স্বচক্ষে শাইখের কারামত দেখেছেন, তাদের উদ্ধৃতিতে কয়েকটি কারামতের কথা উল্লেখ করছি।[২] তবে প্রথমে আমার

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৯-৫০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৩-৫৮ থেকে গৃহীত।

দেখা কয়েকটি কারামাতের কথা বলে নিই—

» একবার বেশ কয়েকটি মাসআলা নিয়ে আমাদের মাঝে আলোচনা হচ্ছিল। দীর্ঘ আলোচনার পরও কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে আমরা স্থির করি, শাইখের কাছে যাব; তিনি যে বক্তব্যে প্রাধান্য দেবেন, আমরা সেটাই মেনে নেব। ঘটনাক্রমে তখনই শাইখ আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। আমরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি আমাদের আলোচিত মাসআলাগুলো একে একে বলে দেন। এমনকি যে দলিলগুলো আমরা নিজেদের মতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছিলাম, সেগুলিও বাদ পড়ল না। এরপর তিনি প্রণিধানযোগ্য দলিলগুলো উল্লেখ করেন। বিতর্কের সুষ্ঠু একটি সুরাহা দেন। আমি, আমার সঙ্গী এবং উপস্থিত সবাই এতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই।

তিনি কোনো মাসআলা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমার মনে কোনো প্রশ্ন উদিত হলে, লক্ষ করতাম, তিনি সেই প্রশ্নের অবতারণা করছেন এবং কয়েকভাবে তার উত্তর দিচ্ছেন। তার সান্নিধ্যে থাকার পুরোটা সময়জুড়েই আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

» শাইখ কারি আহমাদ হারিমি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার আমি দামেশক সফরে যাই। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করি আমার কাছে খরচ করার মতো নগদ অর্থ নেই। স্থানীয় কেউ আমার পরিচিতও নয়। এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আমি উদভ্রান্তের মতো দামেশকের এ গলি থেকে ও গলিতে ঘুরতে থাকি। হঠাৎ দেখি, একজন শাইখ দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসেই প্রথমে আমাকে সালাম দেন। এরপর হাসিমুখে আমার হাতে একথলি দিরহাম দিয়ে বলেন, আপাতত এটা খরচ করুন, মনের দুশ্চিন্তা দূর করুন। আল্লাহ আপনাকে না খাইয়ে মারবেন না। এ কথা বলেই তিনি যেভাবে দ্রুতপদে এসেছিলেন, সেভাবেই দ্রুতপদে ফিরে যান। আমার তখন শুধুই মনে হচ্ছিল, এই শাইখ কেবল আমার জন্যই এসেছিলেন। এটা ভাবতেই মনের গভীর থেকে তার জন্য কল্যাণের দুআ বেরিয়ে এলো। উপস্থিত এক লোকের কাছে শাইখের পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, শাইখের নাম ইবনু তাইমিয়া; আমি দীর্ঘদিন তাকে এই গলিতে আসতে দেখিনি।

আমার দামেশক সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শাইখের সাক্ষাৎ লাভ করা। সে ইচ্ছা আল্লাহ অদ্ভুতভাবে পূরণ করে দিলেন; তার সামনে আমার পরিচয় ও দুরবস্থার কথা প্রকাশ হয়ে গেল, আর তিনিই আমাকে সাহায্য করলেন। তার সাথে সাক্ষাতের পর দামেশক সফরটা দারুণ কেটেছে। কারও দ্বারস্থ হতে হয়নি। পরে শাইখের সন্ধান পেয়ে তার সাথে দেখা করতে যাই। তিনি আমার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন; ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় আমি দুফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিই।

» শাইখ কারি তাকিউদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনি সাইদ আমার কাছে বর্ণনা করেন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া মিশরে অবস্থানকালে একবার আমি মিশর সফরে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিশরে পৌঁছেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাত্রি যাপনের জন্য কাছের একটি সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নিই। কিছুক্ষণ পর শুনতে পাই, কেউ একজন আমার নাম ধরে ডাকছে। ক্ষীণ কণ্ঠে আমি সাড়া দিই। তখন শাইখের একদল সঙ্গী ঘরে প্রবেশ করেন। এত রাতে তারা আমার আগমনের সংবাদ পেলেন কীভাবে—জানতে চাইলে, বলেন, শাইখ নিজেই আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। সেই সাথে বলেছেন, আপনার শরীর ভালো নেই। তাই তিনি আপনাকে দ্রুত স্থানান্তরের আদেশ দিয়েছেন। আমাদের জানামতে কেউ তাকে আপনার সংবাদ দেয়নি। আমরা বুঝতে পেরেছি, এটি শাইখের কারামত।

কারি তাকিউদ্দিন আরও বলেন, দামেশকে থাকতেও আমি একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অসুস্থতার তীব্রতায় আমি বসতেও পারতাম না। তীব্র জ্বরের ঘোরে একবার অনুভব করি, শাইখ আমার শিয়রে বসে দুআ করছেন। তারপর বলছেন, সুস্থতা চলে এসেছে। তিনি এ কথা বলে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আমি সুস্থ হয়ে উঠি।

» শাইখ তাকিউদ্দিন আমাকে আরও একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, শাইখ ইবনু ইমাদুদ্দিন আমাকে বলেছেন, আমি যখন শাইখের ছাত্রত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার কাছে যাই, তখন আমার কাছে অল্প কিছু খরচপত্র ছিল। শাইখের কাছে গিয়ে আমি তাকে সালাম দিই। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে স্বাগত জানান। তার কাছে টেনে নেন। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি, তোমার কাছে খরচাদি আছে কিনা? কয়েকদিন পর আমার হাতে যা সামান্য সম্বল ছিল, সব শেষ হয়ে যায়। মনে মনে ভাবি, সুযোগ বুঝে এবার এই মজলিস ছেড়ে চলে যেতে হবে। একদিন মজলিস শেষে উঠে যেতে উদ্যত হলে, তিনি আমাকে বারণ করেন। ইশারায় বসতে বলেন। মজলিস খালি হয়ে গেলে, আমাকে একটা থলে দিয়ে বলেন, তোমার তো এখন খরচাদি কিছু নেই, এগুলো নিয়ে যাও। তার এই মহানুভবতা ও দূরদৃষ্টিতে আমি অবাক হয়ে যাই। বুঝতে বাকি থাকে না যে, আল্লাহ তার সামনে আমার শুরুর ও শেষের অবস্থা সমানভাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

» এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মঙ্গোলরা যখন দামেশক ও অন্যান্য শহর দখল করার জন্য সিরিয়ায় আসে, তখন সিরিয়াবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একদল লোক শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার কাছে এসে মুসলিমদের জন্য দুআ করতে অনুরোধ করেন। শাইখ কিছুক্ষণ ধ্যান ও দুআ করে বলেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো। তিন দিন পর আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করবেন। তোমরা দেখতে পাবে, ওদের মাথাগুলো একটি আরেকটির ওপর সারিবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে।'

বর্ণনাকারী আরও বলেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শাইখের ভবিষ্যদ্বাণীর পর তিন দিন যেতে না যেতেই আমরা দেখতে পাই, তাদের মাথাগুলো দামেশকের উন্মুক্ত প্রান্তরে সারি বেঁধে পড়ে আছে।

অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা

শাইখ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি নিজে অনেক বিষয়ে শাইখুল ইসলামের দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি দেখে অবাক হয়েছি। যেসব বিষয় দেখিনি, সেগুলো আরও বেশি বিস্ময়কর। তার অন্তর্দৃষ্টির ঘটনাগুলো সংখ্যায় এতই বেশি যে, তা লিখতে গেলে বিশাল আকারের গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে।[১] এখানে দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি মাত্র।

» শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে করা বিষোদগার ও অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রপক্ষ যখন তাকে হত্যা করার জন্য মিশরে তলব করে, তখন সঙ্গীসাথিরা তাকে বিদায় জানানোর জন্য একত্রিত হন। তারা বলেন, আমাদের কাছে এই মর্মে একাধিক চিঠি এসেছে যে, তারা আপনাকে হত্যা করার জন্য কাজ করছে। শাইখুল ইসলাম বলেন, আল্লাহর শপথ! তারা কিছুতেই আমাকে হত্যা করতে পারবে না। সঙ্গীরা বলেন, তবে কি আপনাকে বন্দি করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমাকে দীর্ঘদিন বন্দি থাকতে হবে। তারপর আমি মুক্তি পাব। এরপর আবার জনসমক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কথা বলব।[২]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি নিজে শাইখকে এ কথা বলতে শুনেছি এবং এ ঘটনা বাস্তবায়িত হতে দেখেছি।

» শাইখুল ইসলামের কাছে তার শত্রু জাশিনকিরের রাজক্ষমতা গ্রহণের সংবাদ পৌঁছালে, তার সহচরগণ মন্তব্য করেন, এখন সে আপনার ব্যাপারে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করবে। এই সংবাদ ও মন্তব্যে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং দীর্ঘসময় ধরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এখন থেকে সেই লোকের দোষগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করবে। মানহানি হবে এবং এরই সূত্র ধরে তার পতন ঘনিয়ে আসবে।

ঠিক কখন তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে, এ কথা জানতে চাইলে, শাইখ বলেন, সৈন্যবাহিনী সুবিন্যস্ত হওয়ার আগেই তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে।[৩]

---

[১] *মাদারিজুস সালিকিন*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫২

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫৩

ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া বলেন, তিনি যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই হয়েছিল। আমি নিজে তার কাছ থেকে এ কথা শুনেছি।

ইলমি সাহসিকতা

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলামের সকল গ্রন্থেই দেখা যায়, কোনো হাদিস সহিহ হলে, চোখ বন্ধ করে সেটি গ্রহণ করতেন। সে অনুযায়ীই আমল করতেন। মুজতাহিদ ইমাম ও গবেষক আলিমদের বক্তব্যের ওপরে স্থান দিতেন হাদিসটিকে। তার রচনাবলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তার অবস্থান আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি সুলতান-আমির কিংবা চাবুক-তরবারির ভয় করতেন না। দুনিয়ার কারও কথায় তিনি কুরআন-সুন্নাহ থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। তিনি আল্লাহ তাআলার এই বক্তব্য আঁকড়ে ধরে ছিলেন সারাটি জীবন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

কোনো বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ হলে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটিই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।[১]

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ... ﴿١٠﴾

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফয়সালা তো আল্লাহরই কাছে।[২]

এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনো মাসআলায় একাধিক বক্তব্য দেখতে পেলে, তিনি সেই বক্তব্য অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন, যা কুরআন-সুন্নাহর অধিক অনুকূল হতো।

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে তিনি যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, দীর্ঘ

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯

[২] সূরা শূরা, আয়াত : ১০

সময় ধরে কেউ তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বলে শুনিনি।[১]

সবচেয়ে বড় শত্রুর মৃত্যুসংবাদে শাইখের আচরণ

ইমাম ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি কোনোদিন শাইখকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে বদদুআ করতে দেখিনি। তিনি তাদের জন্য সবসময় কল্যাণের দুআ করতেন। এক লোক শাইখকে খুব বেশি কষ্ট দিত। ভয়ংকর শত্রুতা করত তার সাথে। সে মারা গেলে, আমিই সর্বপ্রথম তার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে শাইখের কাছে যাই। সংগত কারণেই আমার মধ্যে কিছুটা উচ্ছ্বাস কাজ করছিল। শাইখ ব্যাপারটা ধরতে পেরে আমাকে তিরস্কার করেন। আমাকে তার সামনে থেকে চলে যেতে বলেন। এরপর তিনি নিজে মৃতের বাড়িতে যান, তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তোমাদের জন্য আমি তার মতোই। যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে জানাবে, আমি তোমাদের সাহায্য করব।[২]

ইবনু তাইমিয়ার জনৈক সঙ্গী বলেন, 'ইবনু তাইমিয়া তার শত্রু ও বিরোধীদের সাথে যেমন আচরণ করেন, আমি যদি আমার বন্ধুদের সঙ্গে অন্তত তেমন আচরণও করতে পারতাম, তবু নিজেকে সজ্জন মনে করতাম।'

জিনে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় শাইখুল ইসলাম

ইমাম ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখের কাছে একবার জিনে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চাওয়া হয়। তিনি উপস্থিত একজনকে কাছে ডেকে কিছু কথা শিখিয়ে দেন। তারপর বলেন, তুমি রোগীর কাছে গিয়ে এ কথাগুলো বলবে। লোকটি জিনকে লক্ষ্য করে বলে, শাইখ বলেছেন, তোমার জন্য এটা জায়িয হচ্ছে না। এ কথা বলার সাথে সাথেই রোগী জ্ঞান ফিরে পায়।

অনেক সময় শাইখ নিজেই জিনের সাথে কথা বলতেন। জিন অবাধ্য হলে, অনেক সময় পিটিয়েও তাড়াতেন। তবে জিনের প্রভাবমুক্ত হওয়ার পর রোগী কোনো ব্যথা অনুভব করত না। আমি নিজেও কয়েকবার এমন দেখেছি।

শাইখ অধিকাংশ সময় জিনে আক্রান্ত রোগীর কানে এই আয়াতটি পাঠ করতেন—

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

[১] মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭

[২] মাদারিজুস সালিকিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৫

তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?[১]

অনেক সময় আয়াতুল কুরসি পড়েও জিনের চিকিৎসা করতেন। রোগীকে বেশি বেশি আয়াতুল কুরসি, সুরা ফালাক ও সুরা নাস তিলাওয়াত করতে বলতেন।

আল্লামা ইবনুল ওয়ারদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রায়ই দেখতাম, শাইখের ধমক শুনেই অনেক জিন রোগীকে ছেড়ে চলে যেত। শাইখ কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে বলতেন, তুই যদি রোগীকে ছেড়ে চলে না যাস, তাহলে শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী আমল করব। এমন কাজ করব, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হবেন। অমনি জিন রোগীর সংশ্রব ছেড়ে চলে যেত।[২][৩]

---

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১১৫

[২] *আল-জামি লি-সিরাতি ইবনি তাইমিয়া*, মুহাম্মাদ উযাইর শামস ও আলি ইবনু মুহাম্মাদ আল-ইমরান, পৃষ্ঠা : ৩৩৬

[৩] জিনে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সমকালীন প্রকাশনের *জিন, জাদু ও বদনজরের চিকিৎসা* বইটি পড়ুন।

জিহাদের ময়দানে শাইখুল ইসলাম

জিহাদের ময়দানে

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলাম ছিলেন সমকালীন আলিমদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা। আমি তার মতো অকুতোভয়, সাহসী ও কস্টসহিষ্ণু আর কাউকে দেখিনি। তিনি লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে যেমন দ্বীনের শত্রুদের ওপর আঘাত হানতেন, তেমনই তরবারি দিয়েও জিহাদ করতেন সমানতালে। আল্লাহর রাস্তায় কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে কখোনোই পরোয়া করতেন না।

আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি, শাইখ যখন কোনো মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তখন তিনি দৃঢ়তা ও অবিচলতার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াতেন। কেউ ভীতসন্ত্রস্ত, বিশৃঙ্খল বা হতবিহ্বল হয়ে পড়লে, তিনি তাদের সাহস জোগাতেন; আসন্ন বিজয় ও গনিমত প্রাপ্তির সুসংবাদ দিতেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও মুজাহিদের ফজিলত বর্ণনা করে সৈনিকদের মনোবল চাঙা করে তুলতেন।

জিহাদের ময়দানে তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে সোজা শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়তেন। মৃত্যুভয়হীন বীরের মতো হাঁক ছেড়ে এমনভাবে তাকবির দিতেন যে, শত্রুদের মাঝে নিমিষেই ত্রাস ছড়িয়ে যেত।[১]

শাইখুল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ

শাইখুল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল উক্কার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ৬৯০ হিজরিতে মিশরের উক্কা

---

[১] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৬৩

শহরে সংঘটিত হয়। ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানরা উক্কা শহর দখল করে সেখানে লুণ্ঠন-সহ বিভিন্ন অপকর্ম চালাতে থাকে। সেই সময় মিশরের সুলতান ছিলেন আল-মালিকুল আশরাফ খলিল ইবনু কালাউন। তিনি ৬৮৯ হিজরিতে উক্কা শহর পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দেন এবং ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। দামেশক সরকারের পক্ষ থেকেও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। তাদের এই ঘোষণা শুনে বিভিন্ন এলাকা থেকে আলিম, ফকিহ, মুহাদ্দিস-সহ বিভিন্ন স্তরের লোক অংশগ্রহণ করেন। তাদের মাঝে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াও ছিলেন। সেসময় তার বয়স ছিল ২৮ বছর। তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। সে যুদ্ধে শাইখুল ইসলামের অবদান সম্পর্কে হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উক্কার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, শাইখুল ইসলাম এ যুদ্ধে এমন কিছু বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন যা বর্ণনা করা অসম্ভব।[১]

তিনি আরও বলেন, উক্কা শহর পুনরুদ্ধারে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে শাইখুল ইসলামের কর্মকৌশল, দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও দুআ।[২]

তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধ ও ইবনু তাইমিয়ার ভূমিকা

তাতারদের আক্রমণের প্রবল আশঙ্কা দেখা দিলে দামেশকবাসীর সামনে দুটি পথই খোলা থাকে—১. শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া। ২. শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করা। এই নাজুক পরিস্থিতিতে সুলতানের নায়েব, আমির-উমারা সবাই মিলে শাইখুল ইসলামের কাছে আবেদন জানায়, তিনি যেন মিশরে গিয়ে সিরিয়া রক্ষার তদবির করেন এবং সুলতানকে সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেন।

তাদের অনুরোধে শাইখ তৎক্ষণাৎ কায়রোর উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে গিয়ে ৬৯৭ হিজরির ১৭ই শাওয়াল শুক্রবার সুলতানকে বলেন, 'আপনারা যদি সিরিয়া রক্ষায় কোনো পদক্ষেপ না নেন, তবে আমরা নিজেরাই একজন সুলতান বানিয়ে নেব। তিনিই সিরিয়ার দেখভাল করবেন। শত্রুদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে এ শহরকে সুরক্ষিত রাখবেন। আর শত্রু হটে গেলে প্রাণভরে স্বাধীন বাতাসে নিঃশ্বাস নেবেন। জাতির এই দুর্দিনে যদি ভেবে থাকেন, আপনারা সিরিয়ার জন্য দায়িত্বশীল নন, তবে মনে রাখবেন, এই সত্যটি জানা সত্ত্বেও সিরিয়াবাসী আপনাদের সাহায্য করেছে; আপনাদের জন্য ক্ষমতার মসনদ প্রস্তুত করে দিয়েছে। অতএব

---

[১] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৬৮

[২] বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৯২; *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৬৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩২০

আপনাদেরও আজ তাদেরকে সাহায্য করা উচিত। সিরিয়ার সুলতান হয়েও কি আপনারা নির্বিকার থাকবেন! সিরিয়াবাসী আপনাদেরই অধীন, আপনাদেরকে নিশ্চয়ই তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।'

শাইখুল ইসলাম শুধু সুলতানের মাঝেই নিজের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলেননি; বরং তাতারদের বিরুদ্ধে জনগণের দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত, তাও তিনি তাদের মাঝে জাগ্রত করেন। জনসাধারণকে তাতারবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণে জোরালোভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে মুজাহিদদের কী ফজিলত ও বিশেষ সম্মান রয়েছে তাও তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। আর যুদ্ধের ময়দানে কেউ শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলে আল্লাহ তাদের জন্য কী পুরস্কার সাজিয়ে রেখেছেন, সেসব ব্যাপারেও তিনি তাদের প্রলুব্ধ করেন। এভাবে সর্বস্তরের লোকের মাঝে জিহাদি জোশ তরঙ্গায়িত করেন।

এভাবে শাইখুল ইসলাম প্রথমে তাদের মাঝে দায়িত্ববোধ ও আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলেন এবং এরপর প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য সাহস যোগাতে থাকেন। শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিশাল দায়িত্ব অবলীলায় নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেন।[১]

তাতারদের হাত থেকে সিরিয়াকে রক্ষায় শাইখুল ইসলামের ভূমিকা

৬৯৯ হিজরিতে ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান গাযানের নেতৃত্বে তাতাররা সিরিয়া আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাতারদের আক্রমণের খবর শুনে সিরিয়ায় ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। সবাই নিজেদের জীবন নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। লোকজন এলাকা ছেড়ে আশেপাশের শহরে পালাতে থাকে। অনেক লোক রাজধানী দামেশকে চলে আসে। সিরিয়া আক্রমণের কথা শুনে দামেশকের লোকজনও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এদিকে শাইখুল ইসলাম দামেশকের সুলতান ও সাধারণ জনগণকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিতে থাকেন এবং সিরিয়ায় আক্রমণ হলে নিজেদের দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ৬৯৯ হিজরির ২রা মুহাররম মঙ্গলবার মিশরের সুলতান তাতারদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার মুসলিমদের সাহায্য করার ঘোষণা দেন। ৬৯৯ হিজরির ৮-ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার মিশরের সুলতান তার সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশকে প্রবেশ করেন। সেদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তাঘাট ছিল কাদায় পিচ্ছিল। এরপরও মিশরের সেনাবাহিনীর আগমনের কথা শুনে দামেশকবাসী তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানাতে

[১] *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ*, আবুল হাসান নদভি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭০-৪৭১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৪

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দামেশকের সুলতান তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। সুলতান তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দামেশকে ১০ দিন অবস্থান করেন।

৬৯৯ হিজরির ১৭ই রবিউল আউয়াল রবিবার মিশরের সুলতান সৈন্যদল নিয়ে বের হন। শাইখুল ইসলামের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে দামেশকের আলিম-উলামা-সহ অনেক সাধারণ জনগণ মিশরের সৈন্যদলে যোগ দেন। দামেশকের অধিবাসীরা তাদের জন্য দুআ করতে থাকেন। মসজিদে মসজিদে কুনুতে নাযিলা[১] পড়া শুরু হয়।

৬৯৯ হিজরির ২৭ই রবিউল আউয়াল বুধবার সুলতান তার সৈন্যদল নিয়ে দামেশক থেকে ২১২ কিলোমিটার দক্ষিণে সালামইয়া প্রান্তরের খাযানদার ময়দানে পৌঁছালে তাতারিদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুসলিম সৈন্যদলের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে প্রথমদিকে তাতাররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং ৫ হাজারের বেশি তাতারি নিহত হয়। পরবর্তীতে তাতাররা সমস্ত শক্তি ও কৌশল একত্রিত করে আক্রমণ চালায়। তাদের এ আক্রমণের ফলে মুসলিমদের যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে তাতারদের হাতে মুসলিমদের পরাজয় ঘটে। পরাজিত হওয়ার পর সুলতান তার সৈন্যদল নিয়ে মিশর যাত্রা করেন আর দামেশকের আলিম-সহ সাধারণ জনগণও একবুক ভয় নিয়ে দামেশক ফিরে আসেন।[২]

দামেশকে জরুরি পরামর্শ সভা

যুদ্ধে জয়লাভের পর সুলতান গাযান খাঁ দামেশক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ খবর শোনার পর দামেশক আতঙ্কের রাজ্যে পরিণত হয়। সর্বস্তরের জনগণের মাঝে প্রবল ভয় ছড়িয়ে পড়ে। দামেশকের শাসকশ্রেণির অনেকেই মিশর পালিয়ে যায়। পদাতিক সেনাপ্রধান ইলমুদ্দিন, নগর কোতোয়াল জামালুদ্দিন ইবনু নাহহাস, হিসাবরক্ষক-সহ প্রধান বিচারপতি ইমামুদ্দিন শাফিয়ি, মালিকি মাজহাবের বিচারপতি যাওয়াবি-সহ আরও অনেকেই বিভিন্ন শহরে চলে যান। বড় বড় ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তিবর্গ-সহ সকল স্তরের লোকজন যে যেখানে পারেন আত্মগোপন করেন। অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে দাঁড়ায় যে, দুর্গরক্ষক ইলমুদ্দিন ব্যতীত কোনো প্রশাসনিক লোক দামেশকে ছিল না। জেলখানায় তেমন কোনো

---

[১] মানুষসৃষ্ট বিপদ-আপদে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুসলিমদের পরিত্রাণের জন্য বা অন্য কারও ওপর বদদুআ করতে জামাআতের সাথে ফজরের সালাতের শেষ রাকাতে যে বিশেষ দুআ করা হয় তাকে কুনুতে নাযিলা বলে। সাধারণত অত্যাচারিত মুসলিমরা জালিমের বিরুদ্ধে এই দুআ করে বলে কুনুতে নাযিলা বদদুআ হিসেবেই বেশি প্রসিদ্ধ। [*যাদুল মাআদ*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৪; মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত]

[২] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৭১

পাহারাদার না থাকায় ২০০ আসামি পালিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা না থাকায় আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চারদিকে অভাব-অনটন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

এমন নাজুক পরিস্থিতিতে অবশিষ্ট দামেশকবাসী একটি জরুরি পরামর্শ সভার আহ্বান করে। সামনে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার নীতি-নির্ধারণ করাই ছিল এ সভার মূল উদ্দেশ্য। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া সুলতান গাযানের কাছে উপস্থিত হবেন। তিনি তার সাথে পরামর্শ করে দামেশকবাসীর জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।

এরপর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ও বিচক্ষণ কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি ৩রা রবিউস সানি সোমবার সুলতান গাযানের দরবারে যান। তাদের দেখে সুলতান সভাসদদের জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? সুলতানকে জানানো হয়, এরা দামেশকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

পরিচয় পেয়ে সুলতান তাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। শাইখ সামনে এগিয়ে আসেন। তাকে দেখামাত্রই সুলতান গাযানের মনে সমীহবোধ সৃষ্টি হয়। সুলতান তাকে ডেকে নিজের পাশে বসান। শাইখুল ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় সুলতান গাযানকে বলেন—

আপনি নিজেকে একজন মুসলিম বলে দাবি করেন। আমরা অবগত হয়েছি যে, আপনার সাথে ইমাম, মুয়াজ্জিন, কাজি এবং শাইখও রয়েছে। এরপরও কেন আপনি আমাদের দেশে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করবেন? আপনার বাপ-দাদারা তো কাফির ছিলেন। এরপরও তারা আমাদের মুসলিম দেশে যুদ্ধাভিযান চালাননি; বরং আমাদের সাথে চুক্তি করেন। অথচ আপনি একজন মুসলিম হয়ে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করছেন। কথা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

শাইখুল ইসলাম সুলতান গাযানকে বোঝান যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কখনোই কাউকে সাহায্য করা যাবে না। এর পেছনের যৌক্তিক কারণগুলোও তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝান। মুসলিমদের রক্তের মর্যাদার কথা তার সামনে তুলে ধরেন। এ ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তিগত উপদেশ দেন। সুলতান তার কথায় আশ্বস্ত হন এবং মুসলিমদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে সে যাত্রায় মুসলিমদের জানমাল, ইজ্জত-আব্রু ও সন্তানসন্ততি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এভাবে নির্ভয়ে তার সামনে প্রতিবাদ করেন। এরপর সুলতান তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। সবাই তার আপ্যায়ন গ্রহণ করে। কেবল শাইখুল ইসলাম বিরত থাকেন। সুলতান এর কারণ জানতে চাইলে তিনি

বলেন, 'আপনার খাবার কীভাবে খাই বলুন? সবই তো লুট করে আনা পশুর গোশত। রান্নাও করেছেন অন্যের গাছের লাকড়িতে।'

মতবিনিময়ের শেষ পর্যায়ে সুলতান শাইখের কাছে দুআ চাইলে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন, আপনার কালিমাকে বুলন্দ করার জন্যই সুলতান যুদ্ধ করছেন, তাহলে তাকে সাহায্য করুন, শক্তি দান করুন। আর যদি তার যুদ্ধ-জিহাদ হয়ে থাকে রাজত্ব ও প্রাচুর্যের লালসায়, তবে আপনি তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

আল-বালিসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলাম যখন সুলতানের বিরুদ্ধে বদদুআ করছিলেন, সুলতান তখন 'আমিন' বলছিলেন। আর আমাদের ভয় হচ্ছিল, এখনই তাকে হত্যা করা হবে; আর তার রক্ত এসে লাগবে আমাদের জামায়। তাই আমরা আমাদের জামা গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। আমরা যখন সুলতান গাযানের দরবার থেকে বের হই, তখন শাইখুল ইসলামের সাথিরা তাকে বলেন, আপনি তো আমাদেরকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছেন। আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে দিতে চেয়েছিলেন। এমন অপরিণামদর্শী লোকের সাথে আমরা আর যাব না। শাইখুল ইসলাম তাদের কথা শুনে বলেন, আমিও আপনাদের মতো ভীতু কাপুরুষদের সাথে যেতে চাই না। এরপর তার সাথিরা যাত্রা আরম্ভ করলেন আর শাইখুল ইসলাম কিছুক্ষণ দেরি করে তার একান্ত কিছু লোকের সাথে বেরিয়ে পড়েন।[১]

তাতারিদের অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং ব্যাপক লুটপাট

সুলতান গাযান দামেশকবাসীর সাথে যে নিরাপত্তা অঙ্গীকার করেন, তা ৭ই রবিউস সানি শুক্রবার জুমআর সালাতের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। নিরাপত্তার ঘোষণার দুদিন পর ৯ই রবিউস সানি রবিবার ফরমান জারি করা হয় যে, শহরে যত ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও সম্পদ আছে সুলতান গাযানের কাছে জমা দিতে হবে। এসব জিনিস সংগ্রহ করার জন্য আল-মাদরাসাতুল কিমারিয়াতে তহসিলদার বসানো হয়। পরদিন ১০ই রবিউস সানি সোমবার সাইফুদ্দিন কাবজাক আল-মানসুরি তাতারদের সহযোগিতায় দামেশকের আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়, নির্বিচারে চালায় হত্যাযজ্ঞ। ফলে দামেশক শহরে সবকিছুর মূল্য মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়।

কাবজাক তার হাতে দুর্গ সোপর্দ করতে দুর্গের উপপ্রধানের আরজাওয়াশের কাছে লোক পাঠান। কিন্তু আরজাওয়াশ জোরালোভাবে তার বিরোধিতা করেন

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪০৫; সিরাতু শাইখিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ১৭১-১৭৬

এবং তার হাতে দুর্গ তুলে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কাবজাক দুর্গ তার নিজের দখলে নেওয়ার জন্য প্রাণান্তর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এত কিছুর পরও আরজাওয়াশকে সম্মত করা সম্ভব না-হলে কাবজাক দামেশকের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তার কাছে পাঠান। এরপরও তিনি তাদের পাত্তা দেননি; বরং দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন কোনোভাবেই তার হাতে দুর্গ তুলে দেব না। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া আরজাওয়াশকে এই মর্মে চিঠি পাঠান যে, দুর্গের একটি পাথর অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আপনি তাদের হাতে দুর্গ তুলে দেবেন না। আপনি আপনার সর্বক্ষমতা ও চেষ্টা ব্যয় করে তা রক্ষা করবেন। এতেই শামবাসীর কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এই দুর্গকে সংরক্ষণ করবেন। এ দুর্গে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন পর্যন্ত, তা হবে তাদের ঈমান ও সুন্নাহর সূতিকাগার।[১]

১৫ই রবিউস সানি শনিবার তাতার এবং আরমেনিয়ার সিস অধিবাসীরা দামেশকের নিকটবর্তী পল্লি সালিহিয়া, মসজিদ আসাদিয়া, মসজিদ খাতুন ও দারুল হাদিস আশরাফিয়ায় ব্যাপকভাবে লুটতরাজ চালায়। আকিবার জামিউত তাওবা নামক মসজিদ পুড়িয়ে ফেলে। সালিহিয়া পল্লিতে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন। প্রায় ৪শ লোক হত্যা করে এবং ৪ হাজার লোককে বন্দি করে। এছাড়া তারা নাসিরি ও যিয়াইয়া মেহমানখানা এবং ইবনু বুযুরির গ্রন্থাগার থেকে অসংখ্য কিতাবাদি লুট করে নেয়।

সালিহিয়া ও তার আশেপাশে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড থেকে প্রাণ বাঁচাতে অনেক মানুষ হাম্বলি পল্লিতে পালিয়ে যায়। পাষণ্ড তাতার ও সিস অধিবাসীরা সেখানেও আক্রমণ চালায়। তারা পুরো পল্লি ঘিরে রাখে। এরপর সেখানে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে অসংখ্য লোককে হত্যা করে এবং নারীদের বন্দি করে। প্রধান বিচারপতি তাকিউদ্দিনকে তারা নানা উপায়ে শাস্তি দেয়।

এরপর তারা মিযযাহ পল্লিতেও সালিহিয়া পল্লির মতোই ব্যাপক ধ্বংসলীলা, লুটতরাজ ও নির্যাতন চালায়। একইভাবে দারিয়া-সহ অন্যান্য পল্লিও তাদের হিংস্রতা থেকে রক্ষা পায়নি। তাদের এমন ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচতে দলে দলে মানুষ দারিয়ার জামে মসজিদে আশ্রয় নেয়। কিন্তু শকুনদের চোখ সেখানেও পড়ে। তারা বলপূর্বক মসজিদের দরজা ভেঙে মসজিদে প্রবেশ করে এবং বহু মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। নারী ও শিশুদের বন্দি করে নিয়ে যায়।

এভাবে সুলতান গাযান তার নিরাপত্তা ফরমান ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। ২০ই রবিউস সানি বৃহস্পতিবার সুলতান গাযানকে তার প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তা ফরমান

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ১৭৮-১৭৯

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য শাইখুল ইসলাম তার সঙ্গীসাথিদের নিয়ে তার দরবারে যান; কিন্তু তিনি তার সাক্ষাৎ পাননি। তার মন্ত্রী সাদুদ্দিন ও উপদেষ্টা মুসলিমানি ইবনু ইয়াহুদি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অজুহাত হিসেবে বলে, সুলতান এখন অনেক ব্যস্ত; তার সাথে সাক্ষাৎ এখন সম্ভব নয়। তারা আরও বলে, সুলতান দামেশক থেকে এখনো তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি। তারা বোঝাতে চায় যে, সুলতান দামেশক থেকে যে পরিমাণ সহায়-সম্পদ লুটপাটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন, সেই পরিমাণ লুটতরাজ এখনো করা হয়নি।[১]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সেখানে দুই দিন অবস্থান করার পর ফিরে আসেন। তাতাররা এবার সরাসরি দামেশকে হামলা চালায়। আরজাওয়াশ দুর্গ তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা সেই দুর্গে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। আরজাওয়াশ এই অবস্থা দেখে দুর্গের আশেপাশের বিল্ডিং যেমন দারুল হাদিস আশরাফিয়া, আদিলিয়া কুবরাহ, দারুস সাআদাহ পুড়িয়ে দেন; যেন তাতারিরা দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম না হয়।

তাতারিদের আক্রমণের কারণে সবাই ঘরবন্দি হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাটে বিরাজ করে ভয়াবহ নীরবতা। কেউ বের হতো না। কারণ কাউকে দেখলেই তাতারিরা তাকে পরিখা খননের কাজে লাগিয়ে দিত। জামে মসজিদে দুচারজন ছাড়া কেউ উপস্থিত হতো না। জুমআর দিনে সর্বসাকুল্যে এক কাতার লোক হতো। বিশেষ প্রয়োজনের তাকিদে কেউ ঘর থেকে বের হলে ছদ্মবেশে তাতারিদের পোশাকে বের হতো এবং খুব তড়িঘড়ি করে ফিরে আসত। তার আর ঘরে ফেরা হবে না এই বিশ্বাস নিয়ে ঘর থেকে বের হতো।[২]

তাতারিদের অবরোধের ফলে সর্বস্তরের লোকজন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের আয়রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে তাতারদের হত্যা, লুণ্ঠন আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে খাদ্যসামগ্রী আমদানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের মাঝে খাদ্যাভাব চরমমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষ ও বাচ্চাদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

মসজিদ, মাদরাসা, গ্রন্থাগার, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি-সহ সবকিছু লুণ্ঠন করে দামেশকে একদিন রিক্ত করে ১৯ই জুমাদাল উলা শুক্রবার সুলতান গাযান খাঁ দামেশক ছেড়ে নিজের রাজধানী ইরাকে ফিরে যান। তবে ফিরে যাওয়ার সময় ঘোষণা দেন যে,

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭৯-১৮১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮১-১৮২

সিরিয়াতে কাবজাককে আমার প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যাচ্ছি আর বুলাই খাঁকে সেনাপতি করে তার অধীনে ৬০ হাজার সৈন্য দিয়ে যাচ্ছি। আমরা শরৎকালে আবার ফিরে আসব। তখন এসে মিশরও জয় করব।[১]

শাইখুল ইসলাম ও বুলাই খাঁ

গাযান খাঁ চলে যাওয়ার পর কাবজাক ও বুলাই খাঁ লুটতরাজ ও লুণ্ঠন শুরু করে। যারা বন্দি ছিল তাদের মুক্তির জন্য বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করে। শহরের বিভিন্ন স্থানে পতিতালয় ও মদের বার চালু করে। বিভিন্ন মাদরাসা, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিজেদের ভাগ নির্ধারণ করে দেয়। এছাড়া তারা বিনা কারণে নারী-পুরুষ ও বাচ্চাদের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। নির্বিচারে চলে হত্যাযজ্ঞ। দামেশকের দ্বীনি পরিবেশকে ব্যাপক হারে পরিবর্তন করতে থাকে। চারদিকে চারিত্রিক অবক্ষয় হু হু করে বাড়তে থাকে।[২]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া চিন্তা করলেন এভাবে কাবজাক ও বুলাই খাঁকে চলতে দেওয়া যায় না। এভাবে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা বিলীন হয়ে যাবে। দামেশকের বুক থেকে ইসলাম মুছে যাবে। তাই তিনি বুলাই খাঁর সাথে তার সেনানিবাসে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেন। তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া ছিল মৃত্যুকে দাওয়াত দেওয়ারই নামান্তর। ইসলাম ও জাতীয় স্বার্থে নিজের প্রাণের মায়া ভুলে তিনি সেনাপতি বুলাই খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হত্যা, লুটতরাজ, বন্দি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনদিন তার সাথে আলোচনা চালিয়ে যান। তিনি আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম-অমুসলিম সকল বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।[৩]

বুলাই খাঁর পলায়ন

৩রা রজব শুক্রবার সালাতের পর আরজাওয়াশ কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অচিরেই মিশরের সেনাবাহিনী সিরিয়াতে সাহায্যের জন্য আগমন করবে। এ সংবাদ নির্যাতিত মুসলিমের কাছে ছিল তৃষ্ণায় বুকের ছাতিফাটা অবস্থায় এক পশলা শীতল বৃষ্টির মতো। এ ঘোষণার পরদিনই ৪ঠা রজব বুলাই খাঁ তার সেনাবাহিনী নিয়ে পালাতে থাকে। ৭ই রজব দামেশক ও তার আশেপাশের এলাকা তাতারশূন্য হয়ে পড়ে।[৪]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮৬

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮৬

তাতারিরা দামেশক ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর দুর্গ অধিপতি আরজাওয়াশ ঘোষণা করেন, তাতারিরা যেসব প্রাচীর আক্রমণ চালিয়ে ভেঙে ফেলেছে সেসব প্রাচীর পাহারা দিতে হবে। এছাড়া শহরের প্রধান প্রধান ফটক ও প্রবেশপথগুলো কঠোর নজরদারিতে রাখতে হবে। অতএব যার যা আছে তা নিয়ে আপনারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করুন।

এ ঘোষণার পর স্বয়ং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া অস্ত্রহাতে রাতে পাহারার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। সারা রাত তিনি লোকদের পাহারা দেওয়ার ফজিলত এবং জিহাদের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বোঝাতেন। ৬৯৯ হিজরির ১৭ই রজব শুক্রবার শাইখুল ইসলাম একদল সৈনিক নিয়ে দামেশক সফর করেন। তাতারিরা যেসব পতিতালয় ও মদের বার চালু করে, তিনি তা ভেঙে চুরমার করে দেন।[১]

তাতারিদের পুনরাগমন এবং শাইখুল ইসলামের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

গাযান খাঁ দামেশক ত্যাগ করার পূর্বে ঘোষণা করেন, তিনি শরৎকালে আবার ফিরে আসবেন। ৭০০ হিজরির ১লা সফর তাদের পুনরাগমনের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এ খবর শোনার পর দামেশক ও তার আশেপাশের এলাকা আতঙ্ক ও ভীতির রাজ্যে পরিণত হয়। লোকজন এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। খাবার-দাবার, টাকা-পয়সা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস সাথে নিয়ে যে যার মতো দুর্গে আশ্রয় নিতে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পান। তিনি ভাবেন এমন নাজুক পরিস্থিতিতে সঠিক দিকনির্দেশনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। শাইখুল ইসলাম তাই জনসাধারণের মাঝে এ নিয়ে বিভিন্নভাবে উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে দেশ ত্যাগ না করে বীরদর্পে ইসলাম ও দেশের শত্রুদের সাথে লড়াই করার ব্যাপারে উজ্জীবিত করতে থাকেন। তিনি বোঝান, শত্রুদের ভয়ে অর্থসম্পদ ফেলে পালিয়ে যাওয়ার তুলনায় সেই অর্থসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হাজার গুণ উত্তম। তিনি ঘোষণা করেন, এবার তাতারিদের সাথে জিহাদ করা ফরজ। তার এই আহ্বান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শহরে হুকুম জারি করা হয়, অনুমতি ছাড়া কেউ কোথাও যেতে পারবে না। তার এই উৎসাহ, ফতোয়া ও হুকুম জারির ফলে আতঙ্কে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ভয়ভীতি কিছুটা কমে আসে।[২]

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৯০-১৯১

আবারও আতঙ্ক

রবিউস সানি মাসের শুরুতে খবর আসে যে, তাতারিরা বিরাহ নামক স্থানে চলে এসেছে। তাদের এই আগমনের কথা শুনে সিরিয়ার নায়েবের সুলতানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, সৈন্যদলের সাথে অভিজ্ঞ সাধারণ জনগণও তাতারিদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। এ ঘোষণার ফলে প্রায় ৫ হাজার সাধারণ জনগণ সাধ্যমতো অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মসজিদে মসজিদে কুনুতে নাযিলা পড়া শুরু হয়।

কিছুদিন পর শোনা গেল, মিশরের সুলতান তাতারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হওয়ার পর আবারও ফিরে গেছেন। তাদের ফিরে যাবার খবর শুনে আবার জনগণের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সবাই ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়েন। শাইখুল ইসলামের উৎসাহে জনগণের পালিয়ে যাওয়া বন্ধ হলেও এ খবরের পর আবার সবাই শহর ছেড়ে পালাতে থাকে।

মিশরের সুলতানের ফিরে যাওয়ার খবর শুনে সিরিয়ার সুলতান এবং সেনা কর্মকর্তারাও মনোবল হারিয়ে ফেলেন। মনোবল হারিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কারণ গত বছর মিশর ও সিরিয়া যৌথবাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও যুদ্ধের পরও তাতারিদের হাতে তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানী বহন করতে হয়েছিল।

সিরিয়ার সুলতান ও সেনাকর্মকর্তাদের মনোবল ভেঙে যাবার খবর শুনে শাইখুল ইসলাম ১লা জুমাদাল উলা সিরিয়ার সেনাছাউনিতে যান। তিনি সেখানে সুলতান, সেনাপতি ও সেনাকর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহ যোগাতে থাকেন। তিনি বলেন, আমরা যদি দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করি, আল্লাহর ওপর ভরসা করি এবং নিজেদের মনোবল ঠিক রাখি, তবে আমাদের বিজয় নিশ্চিত। এটাই আল্লাহর অঙ্গীকার। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন—

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ... ﴿٦٠﴾

যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার পর সমপরিমাণ প্রতিশোধের পরে আবারও নিপীড়িত হয়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।[১]

[১] সুরা হজ, আয়াত : ৬০

শাইখুল ইসলামের উৎসাহ-উদ্দীপনার পর আবারও তাদের মনোবল ফিরে আসে এবং যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[১]

শাইখুল ইসলামের মিশর সফর

সিরিয়ার নায়েবে সুলতান ও সেনাপ্রধান তাতারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ পেলেও তারা ভালোভাবে জানতেন, তাদের একার পক্ষে তাতারিদের সামনে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মিশরের সহযোগিতা লাগবে। কিন্তু তারা তো ফিরে গেছে। যেকোনোভাবে তাদেরকে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কে আছে এমন, যিনি তাদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে যুদ্ধে রাজি করাবেন?

সিরিয়ার নায়েবে সুলতান ও সেনাপ্রধান অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখেন এ কাজের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন ইবনু তাইমিয়া। তাই তারা তাকে চিঠি মারফত যেকোনো উপায়ে মিশর-বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে অনুরোধ করেন।

শাইখুল ইসলাম তাদের চিঠি পেয়ে ৭০০ হিজরির ৪ঠা জুমাদাল উলা মিশরের উদ্দেশে রওনা দেন। শাইখুল ইসলাম চেয়েছিলেন, মিশরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যেই সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং রাস্তা থেকেই তাদেরকে তাতারিদের বিরুদ্ধে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছার পূর্বেই তারা মিশরের রাজধানী কায়রোতে পৌঁছে যান। শাইখুল ইসলাম ১১ই জুমাদাল উলা কায়রোতে পৌঁছেন এবং সুলতানের দরবারে সাক্ষাৎ করেন।

তিনি মিশরের সুলতানকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, আপনার দায়িত্ব হচ্ছে, এই কঠিন মুহূর্তে তাতারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আপনি আপনার সেনাবাহিনী ও শক্তিসামর্থ্য নিয়ে এখনই সিরিয়ার উদ্দেশে বের হবেন। আপনি যদি মনে করেন, সিরিয়ার কোনো না কোনো সময় প্রয়োজন পড়তে পারে, তবে আপনাকে অবশ্যই সিরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। এমন নাজুক ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও যদি সিরিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা স্বতন্ত্র সুলতান নির্বাচন করব। তার নেতৃত্বে আমরা তাতারিদের প্রতিহত করব।

এরপর তিনি আরও বলেন, আপনারা যদি নিজেদেরকে সিরিয়ার শাসক মনে নাও করেন, তবু তো তারা আপনাদের মুসলিম ভাই। তারা দুর্দিনে আপনাদের কাছে হাত বাড়িয়েছে। ভাই হিসেবে আপনাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা কি ঈমানি কর্তব্য নয়? শুনে রাখুন, আপনারা যদি নিষ্ক্রিয়

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ১৯১-১৯৩

থাকেন, তবে পরকালে আল্লাহর কাছে ছাড় পাবেন না। আপনাদেরকে অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে।

শাইখুল ইসলামের এমন হৃদয় জাগানিয়া আলোচনায় তাদের ঈমানি চেতনা জাগ্রত হয়। তারা শাইখুল ইসলামকে অঙ্গীকার প্রদান করেন যে, তারা তাদের যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য দিয়ে সিরিয়ার সাথে সম্মিলিত জোট গঠন করে তাতারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। শাইখুল ইসলাম তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়ে দামেশকে ফিরে আসেন।[১]

নেমে এলো আল্লাহর গজব

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া ২৭ই জুমাদাল উলা মিশর থেকে ফিরে এসে সিরিয়ায় যান। সেখানে তিনি ৮ দিন দুর্গে অবস্থান করে তাদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে মনোবল বৃদ্ধি করতে পরামর্শ দেন।

সুলতান গাযান তার তাতারি বাহিনী নিয়ে হালব শহরের নিকটবর্তী সিরমিন এলাকায় চলে আসেন। তিনি তার বাহিনীকে আশেপাশের আনতাকিয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় লুণ্ঠন করার জন্য প্রেরণ করেন। তারা সেসব এলাকায় গৃহপালিত পশুপাখি, ছাগল, গরু-সহ যা পায় তা-ই ছিনিয়ে নেয়। আলিম-উলামা, নারী-পুরুষ এবং বাচ্চাদের গণহারে বন্দি করে।

তাতারিদের সিরমিন এলাকায় চলে আসার খবর শুনে শাইখ যাইনুদ্দিন আল-ফারিকি, শাইখ ইবরাহিম আর-রাক্কি, ইবনু কাওয়াম, শাইখুল ইসলামের ভাই শারফুদ্দিন ইবনু তাইমিয়া ও ইবনু খুব্বাযাহ সিরিয়ার নায়েবে সুলতান আল-আফরামের কাছে যান। তারা সেখানে গিয়ে সুলতান ও সেনাপ্রধানকে তাতারিদের এখনই রুখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সুলতান ও সেনাপ্রধান তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

সিরমিন এলাকায় অবস্থানকালে তাতারিদের ওপর আল্লাহর গজব নাযিল হতে থাকে। শুরু হয় প্রবল গতিতে বর্ষণ, শীলা ও ঝড়। একাধারে ৪১ দিন তা জারি থাকে। এতে গাযানের অনেক সৈন্য মারা যায়। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ সৈন্য দিগ্বিদিক পালিয়ে যায়। তাদের সাথে নিয়ে আসা অধিকাংশ ঘোড়া মারা যায়। এমন ভয়ানক অবস্থা দেখে গাযান তার অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যায়।[২]

তাতারিদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে শাইখুল ইসলামের প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত হয়।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৯৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৯৪-১৯৫

শাকহাবের যুদ্ধ ও ইবনু তাইমিয়ার কৃতিত্বপূর্ণ অবদান

৭০২ হিজরির রজব মাসের কথা। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, তাতাররা এবার সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হবে। এ সংবাদ জনসাধারণের মাঝে আবারও অস্থিরতার সৃষ্টি করে। সালাতে কুনুতে নাযিলার ব্যবস্থা করা হয়। পার্শ্ববর্তী কোনো মুসলিম দেশ থেকেই সেনাসাহায্য আসে না। শহরের অধিবাসীরা দলে দলে মিশর ও অন্যান্য নিরাপদ এলাকার উদ্দেশে রওনা করে। মিশর সুলতান ও মিশরীয় সেনাবাহিনীর আগমন যতই বিলম্বিত হচ্ছিল, লোকদের ভেতর অনিশ্চয়তাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮-ই শাবান মিশরীয় বাহিনীর একটা বড় অংশ খ্যাতনামা তুর্কি আমিরদের নেতৃত্বে এসে পৌঁছায়। এরপর আরও একটি দল এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ধীরে ধীরে জনমনে নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসে; ফিরে আসে স্বস্তি। কিন্তু তখন আরেকটি ব্যাপার ঘটে। অন্যান্য স্থানের শরণার্থীরা, বিশেষ করে, উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে ব্যাপক হারে লোকজন দামেশকে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। সেই সাথে বিভিন্ন রকমের গুজবও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সিরিয়ার আমিরগণ একত্র হয়ে শত্রুর মোকাবেলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন। আল্লাহর নামে কসম খান এবং শহরময় ঘোষণা করেন, কেউ যেন শহর পরিত্যাগ না করে।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ শহর থেকে বাইরে গিয়ে সেনাবাহিনীকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং তাদের থেকেও অনুরূপ কসম গ্রহণ করেন। সেই কঠিন দিনগুলোতে তিনি আমির-উমারা ও জনগণকে কসম খেয়ে খেয়ে বলতেন, এবার তোমরা অবশ্যই জয়লাভ করবে। এ ব্যাপারে তিনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে, যদি কেউ বলত, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন, তিনি বলতেন, আমরা মজলুম, আর মজলুমের জন্য আল্লাহর সাহায্য অবধারিত। অতএব আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক বিজয় আমাদের নিশ্চিত, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এই সময় একটি প্রশ্ন সবাইকে বিচলিত করে তোলে। আর যা-ই হোক, তাতাররা তো মুসলিম, অতএব তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা ধর্মীয় বিধানমতে কতটা সংগত? তারা তো কাফির নয়। আবার বিদ্রোহীও বলা যায় না তাদের। বিদ্রোহী নয় এজন্য যে, তারা কখনো কোনো মুসলিম শাসকের আনুগত্যাধীনে আসেনি বিধায় তাদেরকে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা চলে না। সে প্রশ্নও তাই অবান্তর। তাই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে কীসের ভিত্তিতে? আলিমগণ এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েন।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এ দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে বলেন, তারা খারিজিদের ন্যায় বিবেচিত হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুম এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। খারিজিরা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু ও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু—উভয়ের

বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল। তারা নিজেদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করত। তাতাররাও ঠিক তাদের মতোই অপরাপর মুসলিমদের তুলনায় নিজেদেরকে হুকুমতের অধিক হকদার মনে করে এবং বলে আমরা তাদের মোকাবেলায় অধিক হক ও ইনসাফ কায়েম করতে পারি। তারা মুসলিমদের ওপর জুলুমের মিথ্যা অপবাদ দেয়, অথচ মুসলিমদের তুলনায় তারা নিজেরা আরও বেশি মাত্রায় গর্হিত ও ভয়ংকর আচরণে লিপ্ত। তার এই বিশ্লেষণের দ্বারা আলিমগণ সন্তুষ্ট হন এবং পুরো বিষয়টির বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে তিনি এতটা আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বলতেন, তোমরা যদি কখনো আমাকে তাতারদের কাতারে দেখো, তবে আমাকেও হত্যা করবে। আমার মাথায় যদি কুরআনুল কারিম থাকে, তবু আমাকে হত্যা করবে। তার বলিষ্ঠ বক্তব্যে মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায় এবং তাদের মনোবল বেড়ে যায়।

দামেশকে তখন আক্ষরিক অর্থেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। একদিকে সুলতানের আগমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। সিরীয় ও মিশরীয় বাহিনীরও যুদ্ধ করার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে প্রতি মুহূর্তে তাতারদের আগমনের সংবাদ পরিস্থিতি আরও অস্থির করে তুলছে। বিভিন্ন শহর থেকে দলে দলে লোকজন পালিয়ে এসে দামেশকে আশ্রয় নিচ্ছে। গোটা শহর আশ্রিত মানুষে ভরে উঠেছে। এমন সময় ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সৈন্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ের অভিপ্রায়ে সেনানিবাসে যেতে চাইলেন। কিন্তু শরণার্থীদের ভিড়ে পথ ফাঁকা পাওয়াই ছিল দুষ্কর। তার উদ্বেগ আর এদিক-ওদিক ছোটাছুটিকে অনেকেই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, তাকে বাঁকা কথা শোনাতেও ছাড়েনি, আপনি না এতক্ষণ আমাদের পালাতে বাধা দিচ্ছিলেন? আর এখন দেখছি, আপনি নিজেই পালাবার পথ খুঁজছেন?

শাইখ তাদের কথার কোনো জবাব না দিয়ে নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যান। সেসময় শহরে কোনো প্রশাসক ছিল না। পাপিষ্ঠরা সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। লোকজন উঁচু জায়গায় ও মিনারে আরোহণ করে মুসলিম বাহিনী খুঁজে ফিরছিল আর নানান জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে খুব অনিশ্চিত একটা সময় পার করছিল। মানুষের মধ্যে সংশয় ছিল যুদ্ধ কি আদৌ হবে? আর যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে কে বিজয়ী হবে? আল্লাহ না করুন যদি মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় তাহলে মুসলিমদের আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। তাদের ইজ্জত-আব্রু ও জানমালের কোনো নিরাপত্তাই থাকবে না। মোটকথা, এ ছিল নিম্নোক্ত আয়াতেরই প্রতিচ্ছবি—

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ۝ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝

যখন তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে, তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।[১]

ঠিক এমন একটা অবস্থায় ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সিরীয় বাহিনীতে গিয়ে উপস্থিত হন। বাহিনীর আমির-উমারা তাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সত্বর আগমনের জন্য তাকে রাজি করান। তারা জানতেন এ কাজের জন্য তিনিই সবচেয়ে উপযোগী লোক। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার সাথে কথা বলে সুলতানের সংকল্প ও মনোবল আরও অটুট ও সদৃঢ় হয়। সুলতান তাকে সাথে নিয়ে সেনাছাউনিতে আসেন। তার কাছে এই আগ্রহ ব্যক্ত করেন, যুদ্ধকালে তিনি যেন সুলতানের সাথেই থাকেন। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার কওমের পতাকাতলে যুদ্ধ করবে। আর এটাই সুন্নাত। আমি যেহেতু সিরীয় বাহিনীর সাথে আছি, তাই আমি তাদের পতাকাতলেই যুদ্ধ করব। তিনি সুলতানকে জিহাদের জন্য অনুপ্রেরণা দেন এবং শাসক হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তার দৃঢ়তা সুলতানকেও ছুঁয়ে যায়। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, জয় আমাদেরই হবে। এবারও আমিরগণ তাকে স্মরণ করিয়ে দেন, ইনশাআল্লাহ বলাই সমীচীন। কিন্তু তিনি আগের মতোই উত্তর দেন, আমাদের জয় সুনিশ্চিত। আল্লাহ তাআলা যে মজলুম জাতিকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

২৯শে শাবান জুমআর রাতে রামাদানের চাঁদ দেখা গেল। দামেশকবাসী তারাবির প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে রামাদানের আনন্দ, অন্যদিকে শত্রুর ভয় ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা। জুমআর দিন খুব কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। শনিবার দিন লোকজন মিনারে আরোহণ করে দেখতে পেল, সেনাছাউনির দিকে ধুলোবালি উড়ছে। চারদিকে যেন অন্ধকার ছেয়ে আছে। তারা বুঝতে পারল, আজই হবে মোকাবেলা। সাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে দুআ মুনাজাত শুরু হয়। শিশু ও মহিলারা নিজ নিজ দালান-কোঠায় খালি মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। শহরজুড়ে উত্তেজনা। ২রা রামাদান শনিবার বাদ যুহর সুলতানের ফরমান জামে মসজিদে পাঠ করে শোনানো হয়। এতে বলা হয়, শনিবার দিন দুপুর থেকে সিরীয় ও মিশরীয় ফৌজ সুলতানের সঙ্গে কাতারবদ্ধ হবে। মুসলিমরা যেন আল্লাহর দরবারে সাহায্য ও বিজয়ের জন্য দুআ করে এবং দুর্গ ও শহরের আশ্রয়-প্রাচীরে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ১০-১১

২রা রামাদান শাকহাব প্রান্তরে একদিকে সিরীয় বাহিনী ও মিশরীয় ফৌজ, অপরদিকে তাতার বাহিনী কাতারবন্ধ হয়। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ফতোয়া প্রদান করেন, মুজাহিদ বাহিনী যেন সিয়াম ভঙ্গা করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করে। এ সময় তিনি একটি পতাকা ও কিছু খাবার হাতে নিয়ে সৈন্যদের বিভিন্ন সারিতে ঘুরে বেড়ান। তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ইফতার করেন এবং বারবার এই হাদিসটি শোনান, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আগামীকাল দুশমনের সঙ্গো তোমাদের মোকাবেলা হবে। কাজেই সিয়াম ভেঙে নিজেদের শক্তি ধরে রাখবে।'[১]

যুদ্ধ শুরু হলো। সুলতান স্বয়ং এ যুদ্ধে তার সেনাবাহিনীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আব্বাসি খলিফা আবুর রাবি সুলাইমানও সুলতানের পাশেই ছিলেন। দেখতে দেখতে যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক বাহিনীর সৈন্যরা অপর বাহিনীর মাঝে ঢুকে পড়ে। পুরোটা সময় জুড়েই সুলতান অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তিনি তার ঘোড়ার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ময়দান ছেড়ে পালাতে না পারেন। ভীষণ যুদ্ধ চলে। বড় বড় তুর্কি আমির এ যুদ্ধে মারা যান। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমরা বিজয়ী হয়। তাতাররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। প্রাণ বাঁচাতে তারা বিভিন্ন টিলা ও পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নেয়। এদিকে মুসলিমরা সারা রাত জেগে পাহারা দেয়। এ যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক তাতার নিহত হয়। সকালে মুসলিমরা তাদেরকে রশিতে বেঁধে বেঁধে নিয়ে আসছিল এবং তাদের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছিল। পলাতকদের একটা বিশাল অংশই ফোরাতে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হয় এবং অনেকেই নদীতে ডুবে প্রাণ হারায়।

৪ঠা রামাদান সোমবার ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ দামেশকে প্রবেশ করেন। লোকেরা তাকে মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানায়। তার চারপাশ মুবারকবাদ আর দুআয় মুখরিত হয়ে ওঠে। ৫ই রামাদান মঙ্গালবার (৭০২ হিজরি) সুলতান তার সাম্রাজ্যের আমির, খলিফা এবং শাহী ফৌজের সঙ্গো বিজয়ী বেশে দামেশকে প্রবেশ করেন।[২]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১১২০

[২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১

শাইখুল ইসলামের সংস্কার আন্দোলন

সব কিছুর উত্থান-পতন আছে। দ্বীনের ক্ষেত্রেও তা শতভাগ কার্যকর। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া এমন একটি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন ইসলামের আসল রূপ সর্বক্ষেত্রে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ইসলামের গায়ে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে যায়। ইসলামি রাজনীতির জায়গায় কুফরি ও তাগুতি রাজনীতি জগদ্দল পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেড়ে বসে। ইসলামি অর্থনীতির পরিবর্তে সুদভিত্তিক ও ইসলাম পরিপন্থি অর্থব্যবস্থা চালু হয়। মোটকথা, সর্বক্ষেত্রে ইসলামের আলো ঢাকা পড়ে যায়। ইসলামের উজ্জ্বল মুখ মলিন হয়ে যায়। শুভ্র-সফেদ ইসলামের শরীরে কালিমার আঁচড় লাগে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া এমন এক কঠিন ও নাজুক মুহূর্তে মুজাদ্দিদে যামান হিসেবে আগমন করেন। গড়ে তুলেন এক সংস্কার আন্দোলন। ইসলামের নামে যত জঞ্জাল ও আগাছা জন্ম নেয় সব তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। তার সংস্কারধর্মী আন্দোলন সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। হক বর্ণনা এবং দ্বীনকে-সহযোগিতা করার ব্যাপারে ছিলেন অবিচল। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বানকারী একজন একনিষ্ঠ দাঈ। আল্লাহর রাস্তার একজন নির্ভীক সৈনিক। আল্লাহ তার মাধ্যমে দ্বীনের মলিন বিষয়গুলোর মুখে হাসি ফোটান এবং হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সংশয়-সন্দেহের ঘোর অমানিশায় আলোকবর্তিকা হিসেবে উদিত করেন। ফলে তিনি তার মাধ্যমে অন্ধকারের পর্দা উন্মোচিত করেন, তালাবদ্ধ অন্তর খুলে দেন এবং রোগা ও জীর্ণশীর্ণ অন্তরকে সুস্থ করে তোলেন। তার মাধ্যমে মহান রব পথভ্রষ্টদের ভ্রষ্টতা, সংশয়বাদীদের সংশয় এবং বাতিলপন্থিদের অপব্যাখ্যা বিদূরিত করেন। তার ক্ষেত্রে নবিজির সুসংবাদ বাস্তবে রূপ নেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতি শত বছরের মাথায় উম্মতের মাঝে একজন সংস্কারক প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীনকে সংস্কার করবেন।'[১] তার এ বাণীও বাস্তবে রূপ নেয়—'প্রত্যেক যুগে একদল ন্যায়পরায়ণ লোক এই (দ্বীন) ইলমকে বহন করবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি ও বাতিলপন্থিদের অপব্যাখ্যাকে দূরীভূত করবেন।'[২]

রাজনৈতিক সংস্কার

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেন। কারণ তিনি মনে করতেন, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কার না করলে সর্বক্ষেত্রে ইসলামি মূল্যবোধ চর্চা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি রাজনৈতিক ময়দানে সঠিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কী তা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি শাসক শ্রেণিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, দেশকে সুসংহত ও আদর্শিকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে প্রশাসনিক অবকাঠামো শক্তিশালী করাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রশাসনিক অবকাঠামোর ভিতকে কুরআন ও সুন্নাহ সমৃদ্ধ নিয়মকানুন ও নীতির আদলে সাজাতে হবে।

রাজনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে তিনি *আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম* ও *আস-সিয়াসাতুশ শারিয়াহ* নামক দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। উভয় গ্রন্থে তিনি ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরেন। রাজা-প্রজাদের অধিকার কী তা ব্যাখ্যা করেন। ইসলামি প্রজাতন্ত্র কীভাবে গঠন করতে হবে এবং ইসলামি শুরা ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তাও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রে ঘুসকে কীভাবে সমূলে নিশ্চিহ্ন করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

রাজনৈতিক সংস্কারকে গতিশীল করার লক্ষ্যে তিনি শাসকদের সাথে মিতালি রাখতেন। বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে পরামর্শ দিতেন। কোনো বিষয় তাদের অজানা থাকলে তাদেরকে তা জানাতেন। কোনো প্রদেশে বা কোনো অঞ্চলে খারাপ কিছু ঘটলে বা প্রাদেশিক আমির-উমারা কোনো ইসলামি আইন লঙ্ঘন করলে তা থেকে উত্তরণের এবং তা সংশোধনের উপায় বাতলে দিতেন। এভাবে তিনি অন্যায় ও ইসলাম পরিপন্থি জিনিসের পরিবর্তন ঘটাতেন।[৩]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৯১; হাদিসটি সহিহ।

[২] *মুসনাদুল বাযযার* : ৯৪২৩; *শারহু মুশকিলিল আসার* : ৩৮৮৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০৯১১; *মুসনাদুশ শামিইয়িন*, তাবারানি : ৫৯৯; হাদিসটির সনদ অনেক ত্রুটিপূর্ণ, তবে এর অর্থ ও ভাবার্থ সহিহ; যেমনটি ইমাম আহমাদ-সহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *দাওয়াতু শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৬

অর্থনৈতিক সংস্কার

তাতারদের আধিপত্যের সময় চারদিকে বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামবিরোধী নানান কর্মকাণ্ড সমাজে জায়গা দখল করে নেয়। তাতাররা ফিরে যাওয়ার পর দামেশকে সরকার পক্ষের কোনো গভর্নর ও আমির ছিল না। এমন শোচনীয় অবস্থায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া নিজেই গভর্নরের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং সেসব ফিতনা-ফাসাদ ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের মূলোৎপাটনে তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। গোটা দামেশকে তখন মদ্যশালা ও মদের কারবারে ছেয়ে যায়। পূর্ববর্তী গভর্নরের আয়ের মূল উৎস ছিল এসব মাদক ব্যবসা। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া সেসব মদের কারবার বন্ধ করে দেন। মদ্যশালাগুলোকে গুঁড়িয়ে দেন। যদিও সরকারি কোষাগার এ কারণে অর্থনৈতিক লোকসানের শিকার হয়।

তাতাররা সিরিয়ায় আক্রমণ করলে জারদ ও কিসরাওয়ানের পাহাড়ি এলাকার লোকজন সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে তাতারদের সহযোগিতা করে। তাতারদের হাতে সিরিয়াবাসী পরাজিত হলে তারা সিরিয়াবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র, অর্থসম্পদ ও পশু কেড়ে নেয়। তাছাড়া অনেককে তারা হত্যা করে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি মুসলিমদের অনুকূলে এলে শাইখুল ইসলাম তাদের শায়েস্তা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের ওপর হামলা করেন এবং পূর্বের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে চাপ প্রয়োগ করেন। এছাড়া তারা মুসলিমদের থেকে যা কিছু কেড়ে নেয় সব ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদের ওপর বিপুল পরিমাণ সম্পদ রাজ কোষাগারে জমা দেওয়া আবশ্যক করে দেন।

সেনাবাহিনী সংস্কার

তাতার ও খ্রিষ্টানদের ক্রমাগত আক্রমণ এবং নুসাইরাদের[১] বিভিন্ন কূটচালে মুসলিমদের অবস্থা করুণ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিমরা তাদের হাতে পরাজিত হতে থাকেন। এমন নাজুক অবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী সামরিক ও জিহাদি বাহিনী গঠন করা। জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি জনগণকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে থাকেন। মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তাআলা কী পুরস্কার রেখেছেন এবং শহিদদের পরকালে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা তিনি তাদের সামনে তুলে ধরেন। তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় অসংখ্য মানুষ জিহাদের বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে, আল্লাহর রাস্তায় সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং

[১] শিয়াদের একটি উপদল।

সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে। ফলে সামরিক বাহিনীর শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়।

৬৯৯ হিজরিতে তিনি কাযান ও দামেশকের ফটকে এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী দাঁড় করান। সেই বাহিনী তার নেতৃত্বে তাদের হাত থেকে মুসলিম বন্দিদের উদ্ধার করেন।

এভাবে বিভিন্ন উপায়ে তিনি সামরিক বাহিনী শক্তিশালী করেন এবং জনগণকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তাছাড়া স্বয়ং তিনি একাধিকবার জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন; যা আমরা তার জিহাদি অবদান শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ঈমান ও আকিদা সংস্কার

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। তারা ধরার বুকে ঈমান ও তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করতেন। আল্লাহ তাআলা মানব ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়া-আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে ঈমান ও আকিদার ওপর। এ কারণে সকল নবি-রাসুল সর্বপ্রথম ঈমান ও আকিদা সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং সমাজে তাওহিদ ও সঠিক আকিদা পরিপন্থি যত বিষয় রয়েছে, সেসবের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম জারি রাখেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া যে ময়দানে সবচেয়ে বেশি সংস্কারমূলক অবদান রাখেন, তা হলো ঈমান ও সঠিক আকিদা। দামেশক ও তার আশপাশ তখন শিরক ও সঠিক আকিদা পরিপন্থি বিষয়ের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। এমন সঙ্গিন অবস্থা দেখে তিনি সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন। পাথর, গাছগাছালি, স্তম্ভ, ফলক-সহ অন্যান্য শিরকি আস্তানা গুঁড়িয়ে দেন। তিনি যেসব শিরকি আস্তানা গুঁড়িয়ে দেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো।

নজর-নেওয়াজ মানার পাথর গুঁড়িয়ে দেওয়া

কালুত নামক এক নদীর কিনারায় একটি পাথর ছিল। লোকজন সেই পাথর জিয়ারত করত এবং সেখানে বিভিন্ন নজর-নেওয়াজ মানত। এভাবে সে পাথর শিরকের আস্তানায় পরিণত হয়। তারা অজ্ঞতাবশত এখানে এসে নিজেদের ঈমান নষ্ট করত। তিনি লোকদেরকে এমন ঈমান বিধ্বংসী জিনিস থেকে মুক্ত করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। তাই তিনি তার সঙ্গীসাথি ও পাথরওয়ালা লোকদের নিয়ে সেখানে যান এবং তা ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। তার আদেশ মতো তারা তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন।[১]

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৭৮

পাথরের স্তম্ভ ভেঙে ফেলা

আল-বাবুস সাগিরের অভ্যন্তরে দারবুন নাফিদানাইনের অদূরে একটি পাথরের স্তম্ভ ছিল। সে স্তম্ভের ব্যাপারে মানুষেরা অনেক শিরকি ও কুফরি বিশ্বাস পোষণ করত। তারা মনে করত, এই স্তম্ভ তাদের বৃষ্টি দেয়, তাদের ফল-ফসল দেয়। এই পাথর মানুষের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। তাই তারা সেখানে বিভিন্ন নজর-নেওয়াজ মানত, জবাই করত, তাতে চুমু খেত। সেই স্তম্ভকেন্দ্রিক বিরাট শিরক-কুফরি কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাস দেখে শাইখুল ইসলাম স্তম্ভটিকে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। যেদিন তিনি তার সঙ্গীসাথিদের নিয়ে ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে বের হন, সেদিনের এক আশ্চর্যজনক কাহিনি শুনিয়েছেন শাইখুল ইসলামের ভাই ইমাম শারফুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবনু তাইমিয়া।

তিনি বলেন, আমরা সে স্তম্ভটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হই। অনেকেই আমাদের সাথে যোগ দেয়। একপর্যায়ে আমরা সেই স্তম্ভটির কাছাকাছি পৌঁছে যাই। তখন শয়তান গোটা শহরে চিৎকার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। সে তাদের মাঝে নানানভাবে অপপ্রচার চালাতে থাকে। তার অপপ্রচারের ফলে লোকজন ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তাদের কেউ বলে, এ পাথর ভেঙে ফেললে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা সৃষ্টি হবে। আবার কেউ বলে, গাছে কোনো ধরনের ফল ধরবে না। আবার অনেকেই বলে এ পাথরের ফলে ঝরনা প্রবাহিত হয়। ভেঙে ফেললে ঝরনা শুকিয়ে যাবে। আবার কেউ তো বলে বসে, আজকেই ইবনু তাইমিয়ার জীবনের শেষ দিন।

সবার সব ধরনের মন্তব্য ভেদ করে আমরা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে যাই। পৌঁছার পর দেখি আমাদের সাথে গুটিকয়েক ব্যক্তি রয়েছে। যারা আমাদের সাথে এসেছিল তাদের সবাই প্রায় পালিয়ে যায়। তারা মনে করছিল, আমরা এ কাজে জড়িত থাকলে আমাদের যেকোনো বিপদ পেয়ে বসবে বা আমরা কোনো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব।

পাথর ভাঙার লোকদেরকে বললাম, আপনারা পাথরটি ভেঙে ফেলুন। কিন্তু ভাঙা তো দূরের কথা তাদের কেউ ভাঙার জন্য সামনে আগানোর সাহস পর্যন্ত করতে পারল না। তাদের এই অবস্থা দেখে আমি ও ইবনু তাইমিয়া তাদের হাত থেকে কুড়াল নিয়ে পাথরটিতে আঘাত হানতে শুরু করি আর বলতে থাকি—

...جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

সত্য সমাগত আর বাতিল বিতাড়িত। আর বাতিল তো বিতাড়িত হওয়ারই ছিল।[১]

[১] সূরা ইসরা, আয়াত : ৮১

আমরা লোকদেরকে বললাম, কোনো সমস্যা বা ক্ষতি হলে আমাদেরই হবে। আমরা তা অম্লান বদনে নেব। আমাদেরকে দেখে এবার লোকজনও এগিয়ে আসে। তারা তুমুল উৎসাহে তা ভাঙতে থাকে। এভাবে অল্প সময়ে আমরা পাথরটিকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে গুঁড়িয়ে দিই।[১]

কালো ফলক ভেঙে ফেলা

কুব্বাতুল লাহমের পেছন ভাগে মসজিদুল কাফ নামে পরিচিত একটি মসজিদ ছিল। সেই মসজিদে ছিল একটি কালো ফলক। জনশ্রুতি ছিল, বহুকাল পূর্বে এক ব্যক্তির স্বপ্নে নবিজি হাজির হন। নবিজি তার সাথে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেন। লোকটি বলে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তো আমাকে অনেক কিছুই বলবেন, কিন্তু আমি এসব কথা মানুষকে বললে তারা বিশ্বাস করবে না। তখন তিনি বললেন, তোমার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ এই ফলকে আমার ডান হাতের ছাপ রেখে গেলাম। এরপর তিনি তাতে তার ডান হাত স্থাপন করলে তাতে তালু ও পাঁচ আঙুলের ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়।

প্রচলিত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই ফলক শিরকের আখড়ায় রূপ নেয়। মানুষজন তাতে মানত করত। তা থেকে বরকত গ্রহণ করত। অনাবৃষ্টি হলে তার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করত।

শাইখুল ইসলাম ফলকটির কথা জানতে পেরে তিনি তার ভাই শারফুদ্দিন ও সঙ্গীসাথিদের নিয়ে ফলকটির কাছে যান। তিনি ফলকটিকে দেখামাত্রই নিশ্চিত হন যে, এই চিত্রটি বানোয়াট। অঙ্কনকারী নিজেই জালিয়াতির পক্ষে একটি প্রমাণ রেখে গিয়েছে। ডান হাত অঙ্কন করতে গিয়ে ভুলে বাম হাত অঙ্কন করে ফেলেছে সে। শাইখুল ইসলাম ফলকটি ভেঙে চুরমার করে দেন।[২]

বরকত লাভের মূর্তি ভেঙে ফেলা

নারানজের মসজিদের সামনে একটি জাঁতাকল ছিল। সেই জাঁতাকলের মালিকদের কাছে একটি পাথরের মূর্তি থাকত। সেই মূর্তিকে কেন্দ্র করেও শিরকি কর্মকাণ্ড চালু হয়। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের সময় তার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হতো। কোনো বাচ্চার দীর্ঘ অসুখবিসুখ হলে বাচ্চাটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হতো। তারপর সেই মূর্তির পাশে গোসল করানো হতো। সেই মূর্তির সামনে নজরানা হিসেবে খাবার-দাবার ও মিষ্টান্ন দেওয়া হতো।

---

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৮০-৮১

[২] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৮২

শাইখুল ইসলাম মূর্তিটির কথা জানতে পেরে তার ভাই শারফুদ্দিন ও সঙ্গীসাথিদের নিয়ে মূর্তিটির কাছে যান এবং তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন।[১]

শিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান

কিছু মানুষের জীবন বরকতময় ব্যস্ততা আর গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনায় ঘেরা থাকে। ইবনু তাইমিয়ার জীবনও ছিল এমন। তাতারদের বিরুদ্ধে জয় লাভের পরই তিনি বেরিয়ে পড়েন শিয়াদের একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এই দলটি 'বাতেনি শিয়া' বলে পরিচিত। পাহাড়ি এলাকায় ছিল তাদের আবাস। এরা তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত দুটি যুদ্ধেই তাতারদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। নানাভাবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। অনেক মুসলিম শিশু ও নারী-পুরুষ বন্দি হয়েছিল তাদের হাতে। অনেক মুসলিম বন্দিকে তারা খ্রিষ্টানদের কাছে বিক্রিও করে দিয়েছিল। এছাড়া তারা অনেক মুসলিম পরিবারের সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল।

শাইখুল ইসলাম সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শত্রুদের কাউকেই ছাড়া যাবে না, তাহলে আবারও তারা শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তিনি এই শিয়া গোষ্ঠীর কাছে যান। তাদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে তাদের কাছে পৌঁছে কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাদের বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেন। তার কাছে তারা লা-জওয়াব হয়ে পড়ে। সবাই তার ইলমি অস্ত্রের সামনে নতিস্বীকার করে। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। ফলে সবাই তাওবা করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদায় প্রত্যাবর্তন করে এবং তারা যা-কিছু লুণ্ঠন ও অপহরণ করেছিল সব ফিরিয়ে দেয়।[২]

সুফিদের বিরুদ্ধে শাইখুল ইসলামের তৎপরতা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সময়ে সুফিদের কর্তৃত্ব ও তৎপরতা ছিল অবিশ্বাস্য। শাইখুল ইসলামের জন্মভূমি দামেশক ও মিশর ছিল রিফায়ি সুফি-ফকিরদের আখড়া। তারা ইসলামি শরিয়তের কোনো ধার ধারত না। সালাত আদায় করত না। বিভিন্ন নেশায় বিভোর থাকত। জাদু ও তেলেসমাতির মাধ্যমে জনগণকে তাদের দিকে আকর্ষণ করত। শরীরে লোহার বেড়ি ও শিকল পরে থাকত। ধোঁকাবাজির মাধ্যমে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে চলাচল করত এবং শূন্যে ভেসে বেড়াত।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮৩

[২] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ১৮৯

তাদের এসব ধোঁকাবাজিতে সাধারণ জনগণ ও আলিম থেকে শাসকশ্রেণি পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এসব তেলেসমাতিকে তারা কারামত ভাবতে শুরু করে এবং তাদেরকে আল্লাহর ওলি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া তাদের এসব জাদু, তেলেসমাতি ও ধোঁকাবাজির পর্দা উন্মোচন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তাদের সাথে বিতর্ক করেন। জুমআর খুতবায় সুফিদের এসব বিদআত জনতার সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল থেকে এসবের কোনো কিছুই প্রমাণিত নয়। কোনো সালাফ ও অনুসরণীয় পির-মাশাইখ থেকেও এমন কর্মকাণ্ড প্রমাণিত নয়। অতএব এসবের মাধ্যমে রবের নৈকট্য লাভের কোনো সুযোগ নেই; বরং এগুলো সবই বিদআত। আর বিদআত রবের নৈকট্য হাসিলের পরিবর্তে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[১]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া তাদের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করেন। এতে ভণ্ডরা তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে। তারা একটি দলও গঠন করে জামে মসজিদে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শাইখুল ইসলাম তাদের এ চক্রান্তের কথা জানতে পেরে নিজের জীবনের মায়া উপেক্ষা করে সেই মসজিদে জুমআর সালাতে উপস্থিত হন। জুমআর সালাত শেষে তাদের নেতাকে সুফিবাদ নিয়ে তার সাথে আলোচনার করার আহ্বান জানান। কিন্তু তারা আলোচনায় না বসে দলবল-সহ সেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় এবং নায়েবে সুলতানের সরকারি ভবনের চারপাশে জড়ো হয়। তারা সেখানে শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে। তাদের এই অবস্থা দেখে নায়েবে সুলতান তাদের সাথে বিতর্কের আয়োজন করেন। সেই দিনটি ছিল ৭০৫ হিজরির ৯ই জুমাদাল উলা শনিবার।

বিতর্ক বা মুনাযারার আগের রাত শাইখুল ইসলাম ইস্তিখারা করে আল্লাহর কাছে তাঁর দয়া ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তিনি জানতেন, এসব সুফিরা কুরআন-সুন্নাহকে পরোয়া করে না। তাদের সবকিছু পরিচালিত হয় আবেগের ওপর ভর করে। তারা জাদু ও তেলেসমাতির মাধ্যমে আগুনে প্রবেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই তাদের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর দলিল উপস্থাপন করে তেমন কোনো লাভ হবে না। ইস্তিখারা করলে আল্লাহ তার মাঝে ইলহাম করেন যে, তুমিও তাদের মোকাবেলায় তাদের সাথে আগুনে প্রবেশ করবে। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য যেমন আগুন আরামদায়ক হয়ে যায় তোমার জন্যও তেমনই আরামদায়ক হবে, কিন্তু বিভ্রান্ত সুফিরা জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে।[২]

---

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২২২

[২] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২২৫-২২৬

নির্ধারিত দিনে সুফিদের এক বিরাট দল ও শাইখুল ইসলাম নায়েবে সুলতানের দরবারে প্রবেশ করেন। তারা নায়েবে সুলতানকে বলে, আপনি তাকে আমাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাতে বারণ করুন। আমরা আমাদের কাজ করে যাব আর তিনি তার কাজ করে যাবেন। কেউ কারও বিরোধিতা করব না। নায়েব তখন শাইখুল ইসলামকে বলেন, তাদেরকে তাদের মতো থাকতে দিন। শাইখ উত্তরে বলেন, অসম্ভব! মুসলিমদের জন্য কথায় এবং কাজে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হওয়া আবশ্যক। যে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বের হয়ে যাবে, তাকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

এরপর তারা সেখানে সামা ভক্তিমূলক ও কাওয়ালি গানের আসর করতে প্রস্তাব দেয়। শাইখুল ইসলাম কঠোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এগুলো বাতিল কর্মকাণ্ড। তারা যদি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই চায়, তাহলে প্রথমে যেন ভালোভাবে গরম পানি, সাবান ও সিরকা দিয়ে গোসল করে নেয়, এরপর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের কারামতি প্রকাশ করে। অবশ্য এরপরও যদি তারা অক্ষত থাকে, তবু এতে বুজুর্গির কিছু নেই। কারণ ইসলামে ভালোমন্দের মানদণ্ড হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কাজেই এ দুটির বিরোধিতা করে কেউ বুজুর্গ হতে পারে না। এবার বলুন, এদের মতো যারা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধিতা করে, তাদের ব্যাপারে আপনার কী মত?

নায়েবে সুলতান ও আমির-উমারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন আপনি আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বে ভালোভাবে গরম পানি, সাবান ও সিরকা দিয়ে গোসল করে নিতে বলছেন? তিনি বলেন, আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তারা সমস্ত শরীরে ভালোভাবে ব্যাঙের তেল, জামির-লেবুর খাল ও আগুন প্রতিরোধক অন্যান্য উপকরণ মেখে নেয় তারপর আগুনে প্রবেশ করে।

এ কথা বলার সাথে সাথে চারিদিক থেকে আওয়াজ শোনা যায়, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা তাদেরকে এ জাতীয় কিছু মাখতে দেখেছি।

নায়েব তাদেরকে গোসল করতে বললে তারা গোসল করতে রাজি হলো না। এভাবেই সবার সামনে তাদের ধোঁকাবাজি ও মিথ্যা কারামতের ভেদ ফাঁস হয়ে যায়। নায়েবে সুলতান তাদের লোহার বেড়ি ও অন্যান্য পোশাক খুলে ফেলতে বাধ্য করেন এবং ঘোষণা করেন, যারা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে যাবে তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে।[১] সেদিন অনেক সুফি নিজেদের ভ্রান্ত পথ বর্জন করে সঠিক ইসলামে প্রবেশ করেন।

[১] সিরাতু শাইখিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ২২৬-২৫০

শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তার কারাবরণ

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব এক চিরন্তন বাস্তবতা। সৃষ্টির সূচনা থেকে এ বিরোধ চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যখনই কেউ হকের দাওয়াত দিতে চেয়েছে, তখনই একদল তার দাওয়াতকে থামিয়ে দিতে চেয়েছে। সামাজিক কুসংস্কার ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যখনই কেউ আওয়াজ তুলেছে, তখনই তার টুঁটি চেপে ধরতে চেয়েছে তাগুতের দোসরেরা। তবে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের দাওয়াতি কার্যক্রমকে স্তব্ধ করতে পারেনি। বরং তারা যত বেশি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের চলার গতি আরও বেশি শানিত হয়েছে। কারণ তারা ভালোভাবেই জানতেন, জান্নাতের পথ কখনো মসৃণ নয়। বরং জান্নাতের পথে চলতে গেলে প্রতিটি পদে নিত্যনতুন বাধা ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াকেও হক-বাতিলের চিরন্তন এই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি যখন হকের ঝান্ডা তুলে ধরেন, তখন একদল তাকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করে। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলে একটি চক্র তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে। বিভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শাইখুল ইসলাম শত্রুদের দ্বারা কী ধরনের বাধা, সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন তার কিছুটা আমরা তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

ক. কষ্ট ও যন্ত্রণার শিকার

মানুষ দুইভাবে কষ্ট ও যন্ত্রণার শিকার হতে পারে : মানসিক কষ্ট ও শারীরিক কষ্ট। শাইখুল ইসলাম দুই ধরনের কষ্ট ও যন্ত্রণারই শিকার হন।

দ্বীনের সঠিক দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি সীমাহীন মানসিক পীড়া ও যাতনার মুখোমুখি হন। তার বিরুদ্ধে চালানো হয় নানা প্রোপাগান্ডা ও অপবাদের পসরা। একদল তাকে মুজাসসিমা[১] হয়ে যাওয়ার অপবাদ দেয়। আরেকদল তার গায় এঁটে দেয় কুফরির তকমা। অন্যদল দেয় গুমরাহির ফতোয়া। আলাউদ্দিন বুখারি নামে একজন তো জোরালোভাবে ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি তাকে শাইখুল ইসলাম বলবে সেও কাফির।

তার বিরোধীরা তাকে মানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তারা তাকে বিভিন্ন সময়ে শারীরিকভাবেও কষ্ট দেয়। অপমানিত ও অপদস্থ করে। যেমন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসার দাবিদার একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা তার ওপর আক্রমণ করে। তারা তাকে শারীরিকভাবেও কষ্ট দেয়।[২]

খ. ইবনু তাইমিয়ার বিরুদ্ধে আলিমদের অবস্থানের কারণ ও তার পর্যালোচনা

একদল আলিম শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা প্রচার করে বেড়ায়, তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং ইজমা থেকে বেরিয়ে গেছেন। সেই আলিমদের অনুসারীরাও শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে অবস্থান গ্রহণ করে।

আবুল হাসান আলি নদভি তার বিখ্যাত ইতিহাস-বিষয়ক রচনা *তারিখে দাওয়াত ওয়া আযিমাত* গ্রন্থে ইবনু তাইমিয়ার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, আলিমগণ তার বিরোধিতা করেছে নানাবিধ কারণে।

অনেকেই ইবনু তাইমিয়ার বিরোধিতা করত তার উঁচু মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে। জ্ঞানের সকল শাখায় অভূতপূর্ব দক্ষতার দরুন তিনি পরিণত হয়েছিলেন ব্যক্তিবিশেষের ঈর্ষার পাত্রে। দূরদৃষ্টি, প্রখর মেধা, সূক্ষ্ম গবেষণা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং হকের ওপর অবিচলতায় সাধারণ আলিম তো দূরের কথা তার সময়ের জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণের কাছেও তিনি ছিলেন ঈর্ষার পাত্র। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সামনে সবাই যেন ছিল নিষ্প্রভ প্রদীপ। তার সংশ্রবে থেকেছে কিন্তু শাইখুল ইসলামের কোনো প্রভাব তার ওপর পড়েনি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইমাম যাহাবি বলেন, 'তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এমন মনে হত যেন তিনি সমুদ্র থেকে পানি সিঞ্চন করছেন আর অন্যরা করেছেন ছোটখাটো খালবিল থেকে।'

---

[১] একটি ভ্রান্ত দলের নাম মুজাসসিমা। যারা আল্লাহকে তাঁর মাখলুকের সাথে তুলনা করে, সৃষ্টির মতো আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীর সাব্যস্ত করে তাদেরকে মুজাসসিমা বলা হয়। (দেখুন : *মাকালাতুল ইসলামিইয়িন*, আবুল হাসান আশআরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮১; *দারউত তাআরুয*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৪)

[২] *আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ২৮৬-২৮৮

শাইখুল ইসলামের স্পষ্টভাষিতা এবং অনমনীয়তা তার বিরোধিতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। তার কঠোর সমালোচনার কারণে অনেকেই তার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। অন্যথায় যারা তার বিরোধিতা করত, তারাও অকপটে স্বীকার করত তার যোগ্যতা ও প্রখর জ্ঞানের কথা। মাজহাবের বড় বড় কাজি সেসময়ে যুগের প্রয়োজন অনুসারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়—এমন মাসআলাতেও স্বীয় ইমামের মতকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতেন, তিনি এসবের কঠোর বিরোধিতা করতেন। ইমাম যাহাবি বলেন, আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কে কখনো কখনো তার থেকে মেজাজের এমন উগ্রতা প্রকাশ পেত যে—প্রতিপক্ষ তার কথায় অন্তরে ভীষণ আঘাত পেত আর তখনই সেই ব্যক্তির হৃদয়ে শত্রুতার বীজ অঙ্কুরিত হতো। অন্যথায় তার মর্যাদা ও যোগ্যতা নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত ছিল না। কারণ ইবনু তাইমিয়ার সময়ের সকল জ্ঞানীগুণী এ কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করতেন যে, তার জ্ঞানের সমুদ্র কূল-কিনারাহীন। তিনি এমন এক জ্ঞানভাণ্ডার যার দৃষ্টান্ত দুষ্প্রাপ্য খাজানার ন্যায়, যা হাজারো মণিমুক্তা, হিরে-জহরত ও সোনা-দানায় পরিপূর্ণ।

একবার এক মাসআলায় মিশরের প্রধান বিচারপতি তকি ইবনুল আখনায়ি মালিকির সিদ্ধান্তকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার প্রতিউত্তরে একটি পুস্তিকা লেখেন। সেখানে তিনি তকি ইবনুল আখনায়ি মালিকিকে স্বল্প বিদ্যার অধিকারী ও অজ্ঞ বলে উল্লেখ করে লেখেন– 'এই মাসআলায় তকি ইবনু আখনায়ির কলম ধরার কোনো যোগ্যতা নেই।' এ কথা আখনায়ি মালিকির আত্মমর্যাদায় ভীষণভাবে আঘাত হানে। শাইখুল ইসলামের কোনো কোনো জীবনীকার মনে করেন, ইবনু তাইমিয়ার জীবনের সর্বশেষ কারাগার, নজরবন্দি ও দীর্ঘ কারাজীবনের পেছনে আখনায়ি মালিকির ব্যাপারে তার এই উক্তিই মূল কারণ। শেষাবধি তার থেকে কাগজ-কলম এবং কালি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, যাতে তিনি কোনো প্রকার লেখালেখি করতে না পারেন।

সবচেয়ে বড় কারণ হলো–আল্লাহর গুণবাচক নাম ও অন্যান্য গুণাবলির ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম আশআরি আকিদার বিরোধিতা করেছিলেন। সেসময় পুরো দুনিয়ায় এই প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যার চর্চা এবং বিশ্বাসই ছিল 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি। তাদের সেই ব্যাখ্যার বিরোধিতাকে গুমরাহি মনে করা হতো। ইবনু তাইমিয়ার ব্যাখ্যা তাদের মতো না হওয়ায়, তার গায়ে লেপ্টে দেওয়া হয় ভ্রান্ত ও গুমরাহ ফিরকা মুজাসসিমার তকমা। অথচ তার ব্যাখ্যা ছিল সাহাবি, তাবিয়ি ও সালাফুস সালিহিনের অনুরূপ। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা যেরকম মর্যাদায় সমাসীন, ঠিক সেরকমভাবে তাঁর ওপর ঈমান আনাকে সকল আলিম অপরিহার্য মনে করেন। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ—কোনো কিছুই তাঁর (আল্লাহর)

অনুরূপ নয়। তিনি তাশবিহ (কোনো কিছু তাঁর সাদৃশ্য), তাজসিম (সৃষ্টির মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ), নফি (আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার), তাতিল (সকল সিফাত থেকে আল্লাহর অবকাশ গ্রহণ) এমন সবকিছু থেকে মুক্ত।

এছাড়া মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবির বিরুদ্ধাচরণও ছিল তার বিরোধিতার অন্যতম কারণ। শাইখুল ইসলামের নামে পক্ষপাতদুষ্ট ও অসতর্কতাবশত এমন কিছু কথা রটানো হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকিদার বিপরীত। অনেকে তো আবার নিরেট মূর্খতা ও অজ্ঞতাবশত কোনোপ্রকার যাচাই-বাছাই না করেই তার বিরোধিতা করত।

আল্লামা আলুসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা তার বিরোধিতা করে, তারা কয়েক প্রকার। একদল সমসাময়িক হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। আরেকদল যাচাই-বাছাই না করে মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অন্যদল আকিদাগত মতপার্থক্যের কারণে তার বিরুদ্ধাচরণ করে। আবার কিছু লোককে তো ইবনু আরাবি ও তার অনুসারীদের ভালোবাসা ইবনু তাইমিয়ার বিরোধিতা করতে প্ররোচিত করে। আর কিছু লোকের বিরোধিতার কারণ ছিল তার প্রতিপক্ষ আলিমদের তাকলিদ। বাহাউদ্দিন সুবকি একটি কথা বলেছিলেন, তার সেই কথা খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছিলেন, 'জাহিল ও প্রবৃত্তিপূজারি ছাড়া আর কেউ ইবনু তাইমিয়ার বিরোধিতা করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। জাহিল ব্যক্তি তো বুঝতেই পারে না সে কী বলছে। আর প্রবৃত্তিপূজারিকে তার প্রবৃত্তি হক গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করে।[১]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলামের জ্ঞানের সাথে তার বিরুদ্ধবাদীদের জ্ঞানের তুলনা করতে গিয়ে বলেন, 'ইবনু তাইমিয়ার সময়কালে যেসব ফকিহ তার বিরোধিতা করেছিল, তাদের জ্ঞান তার জ্ঞানের ১০ ভাগের একভাগও ছিল না।' [২]

গ. কারাবরণ

ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে হকের দাওয়াত এবং প্রচলিত রসম-রেওয়াজের বিপক্ষে আওয়াজ উঁচু করার কারণে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়েছে, হতে হয়েছে দেশান্তরিত। এমনকি তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। তার কারাবরণের কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো—

---

[১] আন-নাদওয়াতুল আলামিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ১২৫

[১] আন-নাদওয়াতুল আলামিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ১২৫

প্রথম কারাবরণ ও খ্রিষ্টান আসাফের ঘটনা

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আসাফ নামের এক লোক ছিল, সে ছিল সুয়াইদার অধিবাসী। কে বা কারা যেন একবার এ কথা ফাঁস করে দেয় যে, এই আসাফ নবিজিকে গালি দিয়েছে। বিষয়টা ইবনু তাইমিয়ার কানেও পৌঁছায়। তৎক্ষণাৎ তিনি দারুল হাদিসের শাইখ যাইনুদ্দিন আল-ফারিকিকে সাথে নিয়ে ডেপুটি সুলতান ইযযুদ্দিন আইবেক আল-হামাবির কাছে যান এবং আসাফের বিরুদ্ধে নবি-অবমাননার অভিযোগ করেন। বিপুল সংখ্যক নবিপ্রেমী তাদের সাথে যোগ দেন। সুলতান তাদের অভিযোগ গ্রহণ করেন এবং অনতিবিলম্বে আসাফকে দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ জারি করেন। ইবনু তাইমিয়া ও শাইখ যাইনুদ্দিন অনুসারীদের নিয়ে দরবার ত্যাগ করেন।

এরই মাঝে আসাফও সেখানে এক আরব বেদুইনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়। মুহূর্তেই উপস্থিত জনতার মাঝে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তারা আসাফকে গালমন্দ করতে থাকে। হঠাৎ বেদুইন লোকটি পাশ থেকে ফোড়ন কাটে, আসাফই তোমাদের চেয়ে উত্তম। তার কথায় লোকজন আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তাদের দিকে পাথর মারতে শুরু করে। এই ঘটনায় আসাফ ভীষণভাবে আহত হয়। ফলে ডেপুটি সুলতান শাইখ ইবনু তাইমিয়া ও শাইখ যাইনুদ্দিনের ওপর চড়াও হন। দুজনকে ডেকে এনে বেত্রাঘাত করেন। এরপর মাদরাসায়ে আযরাবিয়াতে বন্দি করে রাখেন।

অন্যদিকে আসাফ সবার সামনে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেয়। তার জন্য মজলিসের আয়োজন করা হয়। সেখানে অভিযোগকারী লোকদেরও উপস্থিত হতে বলা হয়। এরপর তাদের ও আসাফের মধ্যকার বিবাদের নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়। সুলতান তাদের প্রাণভিক্ষা দেন। শাইখুল ইসলাম ও শাইখ যাইনুদ্দিন আলফারিকিরও কারাগার থেকে সসম্মানে মুক্তি দেন।

এ ঘটনার পর আসাফ হিজাযে চলে যায়। মদিনার কাছাকাছি পৌঁছালে, তার আপন ভাতিজা তাকে হত্যা করে ফেলে। অপরদিকে শাইখুল ইসলাম রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ আস-সারিমুল মাসলুল *আলা শাতিমির রাসুল*।[১]

মিথ্যা অপবাদে জুব নামক কারাগারে

৭০৫ হিজরির ঘটনা। আহমাদ রিফায়ি দলের কারণে মুসলিম জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তারা গলায় লোহার বেড়ি পরে গায়ে একধরনের তেল মাখত। তারপর

---

[১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৯৬

জ্বলন্ত আগুনে ঢুকে পড়ত। সেই তেলের প্রভাবে তাদের কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু এই কৌশলের কারণে সাধারণ মুসলিমরা ধোঁকায় পড়ে যেত। শাইখুল ইসলাম এই প্রতারকদের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি এই লোকদের বিরুদ্ধে সুলতানের নায়েবের কাছে অভিযোগ তোলেন। নায়েব বলে, তাদেরকে তাদের মতো থাকতে দিন। শাইখ উত্তরে বলেন, অসম্ভব! মুসলিমদের জন্য কথায় এবং কাজে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হওয়া আবশ্যক। যে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বের হয়ে যাবে, তাকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তারা যদি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই চায়, তাহলে যেন প্রথমে ভালোভাবে গোসল করে নেয়, এরপর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের কারামতি প্রকাশ করে। অবশ্য এরপরও যদি তারা অক্ষত থাকে, তবু এতে বুজুর্গির কিছু নেই। কারণ ইসলামে ভালোমন্দের মানদণ্ড হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কাজেই এ দুটির বিরোধিতা করে কেউ বুজুর্গ হতে পারে না। এবার বলুন, এদের মতো যারা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধিতা করে, তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী?

শাইখের এই জোরালো বিরোধিতায় আহমাদিয়ারা লোহার বেড়ি খুলতে বাধ্য হয়। আর যারা কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধিতায় মেতে উঠেছিল, তাদের শিরশ্ছেদ করার আদেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু ঘটনাক্রমে সে বছরই সুলতানের পক্ষ থেকে লিখিত নির্দেশ আসে যেন ইবনু তাইমিয়াকে মিশরে নির্বাসনে পাঠানো হয়। শাইখুল ইসলাম যেদিন বাহনে চড়ে মিশরের উদ্দেশে রওনা হন, সেদিন হিংসুকেরা ছাড়া সকল শ্রেণির মুসলিমই ভীষণ মর্মাহত ছিল। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা শাইখকে বিদায় জানাতে আসে। সবার গাল বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারে নিশ্চিন্ত, শান্ত ও সুপ্রসন্ন।

কায়রো পৌঁছালে, তার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি মজলিসের আয়োজন করা হয়। বিচারক, আলিম, ফকিহ, দেশের গণ্যমান্য যত লোকজন ছিল, সবাই সে মজলিসে একত্রিত হন। অথচ মজলিস জুড়ে পিনপতন নীরবতা। কারও মুখে কোনো কথা নেই। মালিকি মাজহাবের বিচারক যাইনুদ্দিন ইবনু মাখলুফ সবার আগে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, আপনাদের নীরবতায় আমিই শাইখের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার দায়িত্ব নিচ্ছি। ইবনু তাইমিয়া কথা বলতে গেলে, তাকে বলা হয়, আপনি শুধু উত্তর দেবেন; বক্তৃতা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শাইখের তখন এ কথা বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, এখানে আদতে তার বিরুদ্ধে এক বিচারের মজলিস বসেছে; কোনো ইলমি বিতর্কের আয়োজন নয়। তখন তিনি তাদের কাছে প্রশ্ন করেন, আমার বিচারক কে? উত্তর আসে, মালিকি মাজহাবের বিচারক ইবনু মাখলুফই হলেন বিচারক। এ কথা শুনে তিনি ইবনু মাখলুফকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি আমার বিচার করবেন কী করে? আপনার বিরুদ্ধেই তো কত অভিযোগ।

এ কথা শুনে ইবনু মাখলুফ শাইখুল ইসলামকে বন্দি করার আদেশ দেন। তাকে এক সপ্তাহ কিল্লায় বন্দি রাখা হয়। এরপর ঈদের রাতে তাকে এবং তার দুই ভাই শারফুদ্দিন ও যাইনুদ্দিনকে জুব নামক কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। জুব কারাগার ছিল খুবই জঘন্য একটি কারাগার। এ কারাগারে শত্রুদলের সেনা এবং ঘাগু-অপরাধীদের বন্দি করে রাখা হতো। কারাগারটি ছিল চামচিকাদের রাজ্য। চারদিকে গুমোট বাঁধা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধময়। শাইখুল ইসলাম এই কারাগারে কত কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে দিনাতিপাত করেন তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ কারাগারে নাসারাদের বন্দিজীবন কত উত্তম। সেখানে তাদের শিরক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা চাইলে গির্জাও বানাতে পারে সেই সুযোগও দেওয়া হয়েছে। তাদের তুলনায় আমাদেরকে বেশি সুযোগ দেওয়ার দরকার নেই; যদি তাদের সমান সুযোগও দেওয়া হতো। তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় রাখা হয়েছে আর আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে লাঞ্ছনা। আমাকে এবং আমার ভাইদের কোন অপরাধে এখানে বন্দি করা হয়েছে? আমাদের তো মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।[১]

তিনি এ কারাগারে ৭০৫ হিজরির ২৬ রামাদান থেকে ৭০৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত বন্দি থাকেন। ৭০৭ হিজরিতে সেনাকর্মকর্তা হুসামুদ্দিন মুহান্না ইবনু ঈসা মালিকুল আরব স্বয়ং কারাগারে আসেন। তিনি তাকে একক প্রচেষ্টায় মুক্ত করেন।

সুফিদের আন্দোলনের মুখে আবার কারাগারে

৭০৭ হিজরিতে কারাগার থেকে তার মুক্তি লাভ করার কথা ভ্রান্ত সুফিরা শুনতে পায়। তার কারামুক্তির কথা শুনে তার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন শুরু করে। তারা কারাগারের চারপাশে একত্রিত হতে থাকে এবং জোরে স্লোগান দিতে থাকে। সুলতান জিজ্ঞেস করেন এদের কী হয়েছে? বলা হয়, ইবনু তাইমিয়ার মুক্তির প্রতিবাদে তারা আন্দোলনে নেমেছে।

সুলতান তাদেরকে শান্ত করতে বললেন, আমরা ইবনু তাইমিয়া ও আপনাদের নিয়ে অমুক দিন বৈঠকের আহ্বান করছি। সেদিন আপনারা সবাই নিজেদের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করবেন। নির্ধারিত দিনে বৈঠক বসে। তাতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। একপর্যায়ে বিতর্ক শুরু হয়। শাইখুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে এত দলিল ও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন যে, তারা একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে যায়। কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। এভাবে তারা হাজারো মানুষের সামনে পরাজিত হয়।[২]

---

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৩২০

[২] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৩২৭

সেদিন পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেও তারা আবার আন্দোলন শুরু করে। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে সুলতান আবার তাকে সেই বছর তথা ৭০৭ হিজরিতেই বন্দি করেন। তিনি এবার ১৬ দিন কারাগারে অবস্থান করেন। ১৬ দিন পর তার সঙ্গীসাথিরা কারাগারে উপস্থিত হয়ে তাকে বলেন যে, আমরা দামেশকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনিও আমাদের সাথে দামেশকে চলুন। তিনি তাদের মান রক্ষার্থে তাদের সাথে দামেশক যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হন। ৭০৭ হিজরির ১৮ই শাওয়াল তিনি দামেশকের পথে যাত্রা শুরু করেন।

শাইখুল ইসলাম যখন দামেশকের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন কাজি ইবনু মাখলুফ মালিকি অসুস্থ ও অজ্ঞান ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি এ খবর শুনতে পেয়ে হিংসাবশত তাকে আবার মিশর ফিরিয়ে আনতে অধ্যাদেশ জারি করেন। তার আদেশমতো তাকে আবার মিশর ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরিয়ে আনার পর তাকে কোথায় রাখা হবে কারাগারে নাকি মুক্ত—এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। এ অবস্থা দেখে শাইখুল ইসলাম স্বেচ্ছায় কারাগারে চলে যান। এভাবে দুই মাসের বেশি কারাগারে বন্দি থাকার পর ৭০৮ হিজরিতে কারামুক্ত হন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসন

৭০৮ হিজরিতে শাইখুল ইসলাম কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর পুনরোদ্যোমে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। সমাজের বুকে জেঁকে বসা বিভিন্ন শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন করে গড়ে তোলেন। বিভিন্ন স্থানে দারস চালু করেন। ফলে লোকজন তার কাছে স্রোতের গতিতে আসতে শুরু করে এবং তার সাহচর্য লাভে নিজেদের ধন্য মনে করতে থাকে।

তার এমন আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা শত্রুদের গায়ে নুনের ছিটা হয়ে দাঁড়ায়। তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে, এখানে তিনি অবস্থান করলে তারা সমাজের বুকে তাদের কর্তৃত্ব ও সম্মান হারাবে। তাই তারা তাকে সেখান থেকে নির্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা তাকে আলেকজান্দ্রিয়াতে নির্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়।

তারা নানাভাবে চক্রান্ত করে ৭০৮ হিজরির সফর মাসের শেষ শুক্রবার তাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় যেতে বাধ্য করে। তারা তার সঙ্গীসাথিদেরও তার সাথে সফর করতে দেয়নি। তিনি টানা ১০দিন সফর করার পর রবিবার আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছান।

শাইখুল ইসলামের শত্রুরা বেশ কিছু দুরভিসন্ধি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়। তারমধ্যে অন্যতম ছিল, মিশরের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা। মিশরের লোকেরা তার সাথে যোগাযোগ রাখতে ব্যর্থ হবে। তাছাড়া আলেকজান্দ্রিয়া ছিল

কট্টর পির-ফকিরের তীর্থভূমি। সেখানকার অধিকাংশ জনগণ ইত্তিহাদ, হুলুল, ওয়াহদাতুল ওজুদ-সহ বিভিন্ন কুফরি আকিদায় বিশ্বাসী ছিল। তাই তারা ভেবেছিল, তিনি সেখানে তাদের মাঝে দাওয়াত দিতে গেলে তারাই তাকে মেরে ফেলবে।

তার শত্রুরা যে উদ্দেশ্যে তাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়, সে উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। শাইখুল ইসলাম সেখানে পৌঁছে সর্বচেষ্টা ব্যয় করে দাওয়াতি কাজ আরম্ভ করেন। তিনি মানুষদের সামনে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দিতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান। তাদের সামনে দ্বীনের সঠিক রূপ তুলে ধরেন এবং ভণ্ড পিরদের গলদ ও ইত্তিহাদ, হুলুল ও ওয়াহদাতুল ওজুদ-সহ বিভিন্ন কুফরি আকিদার অসারতা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্ট করেন।

তার দাওয়াতের ফলে অনেক লোক নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তারা তাওবা করে শাইখুল ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দেয়। গভর্নর, বিচারক, ফকিহ, মুফতি, পির, সুফি-সহ সকল স্তরের লোকের মাঝে তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। তারা নিজেদের ভ্রান্তির কথা উপলব্ধি করে। ফলে তারা পূর্বের কুফরি ও শিরকি বিশ্বাস বর্জন করে সঠিক বিশ্বাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এভাবে আলেকজান্দ্রিয়ার মাটিতে কুফরি ও শিরকি আকিদার পরিবর্তে সুন্নাহ-ভিত্তিক সঠিক বিশ্বাসের পতাকা উড্ডীন হয়।

৭০৯ হিজরির ঈদুল ফিতরের দিন সুলতান নাসির মিশরের সিংহাসনে ফিরে আসেন। তিনি শাইখুল ইসলামকে মুক্ত করে সসম্মানে কায়রোতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বেরিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হন। তাকে বিদায় জানাতে শহরবাসী বেরিয়ে আসে। পথের দুই ধার মানুষে ছেয়ে যায়। সবাই দুআ করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা যেন আবারও শাইখকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন। এভাবেই সকলের মনে জায়গা করে নিয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রস্থান করেন। সে ছিল বেদনাবিধুর অনন্য এক দৃশ্য!

শাওয়ালের ১৮ তারিখে শাইখুল ইসলাম কায়রো এসে পৌঁছান। ২৪ তারিখ শুক্রবার সুলতানের সাথে মিলিত হন। সুলতান তার সম্মানে জাঁকজমকপূর্ণ এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দরবার হলে মজলিস ডাকা হয়। মিশর ও সিরিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মজলিসে উপস্থিত হন। সুলতানের ডানপাশে মিশরের কাজি আর বামপাশে সিরিয়ার কাজি আসন গ্রহণ করেন। সাধারণ জনতা সুলতানের পেছনে। আর সুলতান আরোহণ করেন সুউচ্চ এক আসনে।

সবাই নিশ্চুপ। মজলিস জুড়ে পিনপতন নীরবতা। এরই মধ্যে হঠাৎ সুলতান সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুলতানকে দাঁড়াতে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে যায়। সুলতান সিংহাসন ছেড়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। উপস্থিত জনতা দেখতে

গেল, শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়া মজলিসে প্রবেশ করছেন। আর তাকে স্বাগত জানাতে সুলতান সিংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে এসেছেন। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত আমির-উমারা, কাজি-নায়িব সবাই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সুলতান ও শাইখুল ইসলাম সালাম বিনিময় করলেন। তারপর সবার সামনে দিয়ে হেঁটে দুজনে বাগানে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর তারা যখন মজলিসে ফিরে এলেন, তখনো শাইখের হাত সুলতানের হাতে। মজলিসে ফিরে সুলতান সিংহাসনে সমাসীন হলেন। আর আমির-উমারা ও কাজিদের কাছে শাইখুল ইসলামকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। শাইখের ব্যাপারে তার কাছের সাথীরাও কখনো এভাবে প্রশংসা করেনি।

সেই মজলিসেই উজির সুলতানকে জানাল যে জিম্মিরা সাদা পাগড়ি পরার জন্য প্রতিবছর অতিরিক্ত সাত লক্ষ দিরহাম খরচ করছে। উজিরের কথা শুনে সুলতান বিচারকমণ্ডলী ও উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের মতামত কী?'

কিন্তু কেউই কোনো উত্তর দিল না। সবাইকে চুপ থাকতে দেখে শাইখুল ইসলাম দাঁড়িয়ে গেলেন। কঠোরভাবে উজিরের বক্তব্য খণ্ডন করলেন। সুলতান নম্র ভাষায় শ্রদ্ধার সাথে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। শাইখুল ইসলাম তখন এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যার অনুরূপ শব্দে তো বটেই; কাছাকাছি কিছু বলার মতো সাহসও কারও ছিল না। শাইখের কথায় সুলতান সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। জিম্মিরা যেভাবে আছে, সেভাবেই যেন থাকে এ মর্মে হুকুম জারি করলেন।

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি

সুলতান নাসির পুনরায় শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলে রুকনুদ্দিন বাইবার্স জাসিনকির পালিয়ে যায়। যারা ইতিপূর্বে শাইখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, তাদের মনে ভয় ঢুকে যায়। তারা আশঙ্কা করতে লাগল, দুর্ব্যবহার ও সীমালঙ্ঘনের কারণে না জানি তাদের কী শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়! কিন্তু ক্ষমতার জোরে প্রতিশোধ নেওয়ার মতো লোক তো তিনি নন। বরং তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

শাইখুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন, সুলতান নাসির তার সাথে বাগানে বসার পর একটি ফতোয়া দেখালেন। মজলিসে উপস্থিত কয়েকজন আলিম তাকে হত্যা করার ব্যাপারে ফতোয়াটি দিয়েছিল। সেই আলিমদের হত্যা করা যাবে কিনা—এ ব্যাপারে সুলতান ইবনু তাইমিয়ার মতামত জানতে চাইলেন। শাইখুল ইসলাম বলেন, আমি সুলতানের কথার অর্থ জানতাম। তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে মালিক মুযাফফার রুকনুদ্দিন বাইবার্স জাসিনকিরের হাতে বাইআত গ্রহণ করায় তিনি যে তাদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলেন, সে কথা বুঝতে আমার বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু তখন আমি সেই আলিমদের ভূয়সী প্রশংসা করলাম। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। সুলতানকে বোঝালাম, এরা যদি হারিয়ে যান, তাহলে সুলতান এদের মতো আর কাউকে খুঁজে পাবেন না। আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই, এ কথাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলাম। এভাবে আস্তে আস্তে সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত হলো।

শাইখুল ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কাজি ইবনু মাখলুফ মালিকি বলেন, আমরা ইবনু তাইমিয়ার চেয়ে ক্ষমাশীল আর কাউকে দেখিনি। তাকে কষ্ট দেওয়ার সম্ভাব্য কোনো উপায় আমরা বাকি রাখিনি, অথচ তিনি যখন আমাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা হাতে পেলেন, তখন আমাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দিলেন।

বিদআতের বিরুদ্ধে লড়াইও অব্যাহত রাখলেন। তারপর একসময় মিশরি বাহিনীর সাথে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশে রওনা দিলেন। তাদের সাথে আসকালান পর্যন্ত পৌঁছে তিনি বাইতুল মাকদিসে চলে যান। সেখান থেকে আজলুন হয়ে দামেশকের পথ ধরেন। ৭১২ হিজরির জিলকদ মাসে তিনি দামেশকে পৌঁছান। সব মিলিয়ে সাত বছর সাত সপ্তাহ তিনি দামেশকের বাইরে ছিলেন।

মিশরে কারাগারের বাইরে ও ভেতরে শাইখুল ইসলাম যত দিন ছিলেন, সেসময়ের মাঝে তিনি বেশ কয়েকটি চিঠি লেখেন। তার মধ্যে একটি চিঠি ছিল তার মায়ের উদ্দেশে লেখা। সে চিঠিতে তিনি মায়ের কাছে তার মিশরে অবস্থানের কারণগুলো বুঝিয়ে বলেছিলেন। ইলম শিক্ষা এবং মানুষকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য মিশরে অবস্থান করা কেন খুব জরুরি সে কথা তুলে ধরেছিলেন। সেই চিঠির ছত্রে ছত্রে মায়ের প্রতি শাইখের গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছিল। এ চিঠি-সহ প্রতিটি চিঠিই লেখা হয়েছে চমৎকার শৈলীতে।

আরেকটি চিঠি ছিল দামেশকে অবস্থানরত ভাইদের উদ্দেশে লেখা। সেই চিঠিতে তিনি তার ভাইদের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

মায়ের কাছে ইবনু তাইমিয়ার চিঠি

মানুষের জীবনে বড় হওয়ার যতগুলো পথ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা পথ হলো মা-বাবার দুআ। মা-বাবার দুআ ও সন্তুষ্টি সন্তানের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াও এই সত্যটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজের মা-বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। সবসময় তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতেন।

মিশরে অবস্থানকালে তিনি তার মাকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে প্রকাশ পায় মায়ের প্রতি তার সম্মান ও ভালোবাসার অনুপম চিত্র। আমরা শাইখের সেই চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি—

আহমাদ ইবনু তাইমিয়ার পক্ষ থেকে সম্মানিতা মায়ের প্রতি...

আল্লাহ আপন অনুগ্রহ ও রহমতে আপনার চোখ শীতল করুন, আপনার ওপর দয়ার চাদর বিছিয়ে দিন এবং আপনাকে একজন উত্তম দাসী ও বান্দি হিসেবে কবুল করুন।

প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করছি। তিনিই একমাত্র সত্য ইলাহ। সকল প্রশংসার উপযুক্ত কেবল তিনিই। তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আমরা তাঁর কাছেই দুআ করি। তিনি যেন শেষ নবি, মুত্তাকিদের ইমাম, তাঁর বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর শান্তি বর্ষণ করেন।

আপনাদের কাছে চিঠি লিখতে পারা আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ নিয়ামত। এজন্য আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর কাছে আরও বেশি দয়া ও রহমত কামনা করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহর দয়ার কোনো সীমা নেই।

মা, আপনারা জানেন, আমি কিছু জরুরি প্রয়োজনে এই দূরদেশে অবস্থান করছি। এসব বিষয়ে অবহেলা করলে, দ্বীনি ও দুনিয়াবি—সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যাবে।

আল্লাহর কসম, আমার এই দূরে থাকা নিজের ইচ্ছায় নয়। যদি ডানা থাকত, তাহলে উড়ে আপনাদের কাছে চলে আসতাম। কিন্তু তাকদিরে এমনটি লেখা নেই।

অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো জানলে, আপনারাও এই সময়ে এমন সিদ্ধান্তই নিতেন। এখানে তো আমার এক মাসও থাকার ইচ্ছে ছিল না। প্রতিদিনই আমি আপনাদের ভালোর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি। আপনারাও আমার জন্য কল্যাণের দুআ করবেন। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের জন্য, আপনাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য এমন কিছুরই ফয়সালা করেন, যাতে কল্যাণ রয়েছে।

এখানে আসার পর আল্লাহ তাআলা আমার জন্য এমন কল্যাণ, রহমত, হিদায়াত ও বরকতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, যা কখনো আমি কল্পনাও করিনি। তবু প্রতি মুহূর্তেই বাড়ির জন্য আমি অস্থির হয়ে থাকি, আর আল্লাহর কাছে

কল্যাণের দুআ করি।

কেউ যেন কখনো এমন না ভাবে, দুনিয়াবি কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আপনাদের থেকে দূরে আছি। এখানে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আছে, যা অবহেলা করলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যা দেখা সম্ভব, অনুপস্থিত কেউ হয়তো তা বুঝতে পারবে না।

এই দূরদেশে আপনাদের কাছে আমার একমাত্র চাওয়া এটাই—আপনারা আমার জন্য বেশি বেশি কল্যাণের দুআ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন, আর আমরা কিছুই জানি না। তিনিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান, আর আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। তিনিই অদৃশ্যের সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা[১] করতে পারা আদম সন্তানের সৌভাগ্য; আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে ফয়সালা করেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও আদম সন্তানের সৌভাগ্য। আর ইস্তিখারা ত্যাগ করা আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের কারণ। আল্লাহ তাআলা যে ফয়সালা করেন, তার প্রতি রুষ্ট হওয়াও আদম সন্তানের জন্য দুর্ভাগ্যই বয়ে আনে।[২]

ব্যবসায়ীরা অনেক সময় পণ্যসামগ্রী নিয়ে সফর করে। যখন তাদের মনে পণ্য হারানোর ভয় আসে কিংবা পণ্যের সুরক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়, তখন তারা বাধ্য হয়ে সফর মুলতবি রাখে। আমাদের পরিস্থিতিও অনেকটা সেই ব্যবসায়ীদের মতো। বরং সত্যিকার অর্থে, আমাদের পরিস্থিতি তো আরও করুণ আর শোচনীয়, এ অবস্থার কথা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সহায়, তিনি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই।

বাড়ির ছোটবড় সবার প্রতি, সকল প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি রইল অসংখ্য সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর।'[৩]

---

[১] কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে কিংবা আসন্ন কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে দুরাকাত সালাত ও হাদিসে বর্ণিত বিশেষ দুআ পাঠের মাধ্যমে বিশেষ প্রার্থনাকে ইস্তিখারা বলে। [দেখুন : *সহিহুল বুখারি* : ১১০৯; *আল-মাজমু*, ইমাম নাবাবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮]

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ১৯০৩; *জামিউত তিরমিযি* : ২১৫১; হাকিম ও যাহাবি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

[৩] *রিজালুল ফিকর ওয়াদ দাওয়াহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০৩-৫০৪

তালাকের মাসআলায় আবার কারাবরণ

শাইখুল ইসলাম অনেক ফিকহি মাসআলায় নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন। তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, তালাকের শপথ করলে সেই শপথ রক্ষা করা আবশ্যক নয় এবং সেই শপথ ভঙ্গা করলে তালাক সংঘটিত হবে না। তিনি তালাকে মুয়াল্লাক বা শর্তযুক্ত তালাক ও তালাকের শপথের ব্যাপারে ভিন্ন হুকুম প্রদান করেছেন।[১] এক্ষেত্রে তিনি চার মাজহাবের ইমামগণের বিপরীত মত পোষণ করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাজহাবের অনুসারী আলিমগণ তার এ ফতোয়া অপছন্দ করেন এবং তারা তাদের অপছন্দের কথা প্রকাশও করেন।

৭১৮ হিজরির ঘটনা। কাজি শামসুদ্দিন ইবনু মুসলিম হাম্বলি তাকে ৭১৮ হিজরির রবিউস সানি মাসের মাঝামাঝিতে এ ফতোয়া দিতে নিষেধ করেন। শাইখও তার কথা মেনে নেন। সুলতানের পক্ষ থেকে বলা হলো তিনি যেন এই মাসআলাটি নিয়ে আর ফতোয়া না দেন এবং এই মর্মে সারা দেশে তা ঘোষণা দেওয়া হলো।

শাইখ কিছুদিন বিরত রইলেন, কিন্তু তারপর তার আশঙ্কা হলো তিনি ইলম গোপন করার কারণে গুনাহগার হয়ে পড়ছেন। ফলে আবারও তিনি এই মাসআলায় ফতোয়া দিতে শুরু করলেন। এ কথা যখন সুলতানের কানে পৌঁছাল যে শাইখ তার আদেশ মানেননি, তখন তিনি আরও জোরদার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। সময়টা ছিল ৭১৯ হিজরির ১৯ রামাদান। জারি হলো সুলতানের কঠোর নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু শাইখ সেই ঘোষণার পরোয়া না করে, তার ফতোয়া দিয়ে যেতে থাকলেন।

৭২০ হিজরির ২২ই রজব বৃহস্পতিবার সুলতানের নায়েব/নায়িব, বিচারকমণ্ডলী, চার মাজহাবের ফকিহ ও মুফতিদের উপস্থিতিতে দারুল হুকুমে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে কোনোরকম তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে প্রত্যেকেই শাইখের এ কাজের তিরস্কার করেন। সুলতানের নায়েবের নির্দেশে শাইখুল ইসলামকে বন্দি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৭২০ হিজরির রজব মাসের ২২ তারিখ তাকে কারাবন্দি করা হয়। তিনি এবার ১৮ মাস বন্দি থাকেন। ৭২১ হিজরির ১০ই মুহাররমে সুলতানের আদেশে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি নতুন করে আবারও

---

[১] শর্তযুক্ত তালাককে তালাকে মুয়াল্লাক বা ইয়ামিন বিত-তালাক বলে। যেমন, কেউ যদি বলে, 'আমি যদি অমুক কাজটি না করি, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে যদি উক্ত কাজটি না করে, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হবে কি না- এ ব্যাপারে চার মাজহাবের ইমামদের মতে, সে যদি উক্ত কাজটি না করে তাহলে তালাকের শপথ ভঙ্গা করার কারণে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এর বিপরীতে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ইজতিহাদ হলো, এভাবে তার শপথ করাটাই সঠিক হয়নি, তাই এতে কাজটি না করলেও লোকটির স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। [*আশ-শারহুল মুমতি*, ইবনু উসাইমিন, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১২৭]

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং রচনা ও গবেষণায় নিয়োজিত হন।[১]

কবর জিয়ারতের মাসআলায় কারাবরণ

শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিদআতিরা একের পর এক চক্রান্ত করতে থাকে। তাকে দমিয়ে রাখতে আঁটতে থাকে নানারকম ফন্দি। তারই অংশ হিসেবে ৭২২ হিজরিতে বিদআতিরা তার বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে নবিদের কবর জিয়ারতের মাসআলার অভিযোগ নিয়ে যায়।[২] তারা সুলতানকে প্ররোচিত করে। সুলতান তাদের প্ররোচনায় আবার তাকে ৭২২ হিজরিতে গ্রেফতার করেন।

সর্বশেষ কারাবরণ

কারাগার থেকে বের হওয়ার পর বেশিদিন শাইখ মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারেননি। কিছু লোকের মন তার প্রতি বিদ্বেষ, ক্ষোভ আর হিংসায় বিষাক্ত হয়েছিল। তারা ওত পেতে ছিল কীভাবে শাইখকে আবারও কারাগারে নিক্ষেপ করা যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা আবারও তার বিরুদ্ধে এক হয়ে চক্রান্ত করল। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার কবর জিয়ারত-বিষয়ক মতের মূল বক্তব্যকে বিকৃত করে আবারও তারা সুলতানের কাছে চিঠি লিখে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। এরই সূত্র ধরে ৭২৬ হিজরির ৭ই শাবান শাইখকে দামেশকের একটি দুর্গে আটকে রাখার আদেশ দেওয়া হয়।

দুর্গের বড় একটি কক্ষ শাইখের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সুলতানের আদেশে শাইখের খেদমতের জন্য তার ভাই যাইনুদ্দিনও দুর্গে অবস্থান করতে লাগলেন। একই সাথে শাইখুল ইসলামের অনেক ছাত্র ও বন্ধুদেরও গ্রেফতার করা হলো। শাইখের কৃতী ছাত্র ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ছাড়া বাকিদের গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরময় ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে শাইখুল ইসলাম ও ইবনুল কাইয়িম ছাড়া

---

[১] *রিজালুল ফিকর ওয়াদ দাওয়াহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০৪-৫০৫

[২] কবর জিয়ারতের মাসআলা বলতে এখানে শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর-সহ অন্য যেকোনো নবি-রাসুলের কবর সাওয়াবের আশায় জিয়ারত করা এবং কেবল সে উদ্দেশ্যেই সফর করাকে বোঝানো হয়েছে। এই মাসআলায় ইবনু তাইমিয়া বলেন, শুধুমাত্র কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নববি এবং মাসজিদুল আকসা এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনোকিছুর উদ্দেশে (সাওয়াবের আশায়) তোমারা সফর কোরো না। [*সহিহুল বুখারি* : ১১৮৯; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৯৭]

তবে কেউ যদি অন্য কোনো কাজে কোথাও গমন করে এবং সেখানে বা তার আশেপাশে কোনো নবির কবর জিয়ারত করে, তবে তা জায়িয। যেমন, কেউ উমরা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করল। তখন সে নবিজির কবর জিয়ারত করতে পারবে। তবে এককভাবে শুধু নবিজির কবর সাওয়াবের আশায় জিয়ারত করা বৈধ নয়। [*মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৮-৫২৬]

অন্যদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। তবে দুজনকে আলাদা আলাদা রুমে রাখা হয়।[১]

শাইখুল ইসলামের এটাই ছিল সর্বশেষ কারাবরণ। এই কারাবরণের মাধ্যমে তিনি দুনিয়ার কারাগার থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি লাভ করেন। এ কারাগারেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার ইন্তেকালের পর ইবনুল কাইয়িমকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘ. কাগজ-কলম ছিনিয়ে নেওয়া

শাইখুল ইসলামকে দমিয়ে রাখা এবং তার দাওয়াতি কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে যেসব উপায় অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ছিল কলম-কাগজ কেড়ে নেওয়া। শেষবার তাকে নবিদের কবর জিয়ারতের মাসআলায় কারাগারে বন্দি করা হয়।

মালিকি কাজি আব্দুল্লাহ ইবনু আখিন্নায়ি নবিদের কবর জিয়ারতের মাসআলা নিয়ে শাইখুল ইসলামের বিপক্ষে একটি বই রচনা করেন। শাইখুল ইসলাম বন্দি অবস্থায় তার সেই কিতাবের খণ্ডনে বই লেখেন। সেই কিতাবে তিনি মালিকি কাজির অযোগ্যতা ও জ্ঞানের দীনতা প্রমাণ করেন। এতে কাজি রাগান্বিত হয়ে সরাসরি সুলতানের নিকট অভিযোগ করেন এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেন। সুলতান আখিন্নায়িকে সন্তুষ্ট রাখতে শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি তার খাতা-কলম ছিনিয়ে নেন।[২]

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ৭২৮ হিজরির ৯ই জুমাদাল আখিরা সোমবার শাইখ তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়ার কাছ থেকে যাবতীয় কিতাব, কাগজ, দোয়াত ও কলম ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এমনকি বই-পুস্তক পড়তে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১লা রজব তার যাবতীয় কিতাবাদি আদিলিয়া কাবিরাহ লাইব্রেরিতে জমা করা হয়।[৩]

হাফিজ বিরযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কারাগারে তার কাছে ৬০ খণ্ড পাণ্ডুলিপি এবং ১৪ বান্ডিল খাতা ছিল। কাজি ও ফকিহগণ এসব অনুসন্ধান করে নিজেদের মাঝে ভাগবণ্টন করে নেন।[৪]

আমরা পূর্বেই দেখেছি, অধ্যয়ন ছিল তার যাবতীয় অসুস্থতার প্রতিষেধক। কিতাবাদি

---

[১] *রিজালুল ফিকর ওয়াদ দাওয়াহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২৩-৫২৪

[২] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৪২০-৪২৫

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৪৩

[৪] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, খণ্ড : ৪২৫

ও কাগজ-কলম কেড়ে নেওয়া এবং অধ্যয়নে নিষেধাজ্ঞা ছিল শাইখুল ইসলামের জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা। ফলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েন। এই মানসিক পীড়া থেকে বাঁচতে হাতের কাছে যেসব কয়লা পান, তা দিয়েও তিনি লিখতেন। কিন্তু তাতেও তিনি মানসিকভাবে প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বরং তার মানসিক নির্যাতন বেড়েই চলছিল। কিতাবাদি ও কাগজ-কলম ছিনিয়ে নেওয়া তার কাছে ছিল প্রাণ হরণের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। তার জন্য এটি কত বড় অমানবিক নির্যাতন ছিল তা এভাবে বোঝা যায় যে, এই ঘটনার মাত্র ৫ মাস ১৩ দিন পর তিনি নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে রবের সান্নিধ্যে চলে যান।

শাইখুল ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে শাওকানির মূল্যায়ন

শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ সমসাময়িক আলিম ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে নানা ধরনের আঘাত ও বাধার শিকার হয়েছেন। সারাটা জীবন একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। কত যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তার কোনো সীমা নেই। মানুষের ভালো করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, মানুষ তাকে ভুল বুঝেছে, কাছের লোকেরা তাকে ত্যাগ করেছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন, যখন দেখেছেন, তাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণি তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতেও কার্পণ্য করেছে; উপরন্তু নানা অপবাদে তাকে অভিযুক্ত করেছে। আরেক শ্রেণি তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে করেছে বাড়াবাড়ি। প্রথম শ্রেণির লোকেরা যেমন তার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে ভুল করেছে, তেমনই দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরাও তার পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে।

বস্তুত যে আলিম ইলমের গভীরতা অর্জন করেন, সমকালের সবাইকে জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় ছাড়িয়ে যান এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দ্বীন পালন করেন; তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এমনটা হতে দেখা যায়। কারণ অবধারিতভাবেই এমন আলিমকে ঘৃণা করার লোকের অভাব থাকে না, তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও অপবাদ লোকমুখে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সবশেষে তার অবস্থানই হয় সবার ঊর্ধ্বে, তার বক্তব্যই হয় সবচেয়ে উত্তম। তাদের আনা অভিযোগ ও সৃষ্টি করা সমস্যা তাকে প্রকৃত অর্থেই বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যভাষী করে তোলে। তার ইলমে ও আমলে তখন এমন বারাকাহ নেমে আসে, যা দুরাচারী তো বটেই; সাধারণ আলিমদের ভাগ্যেও জোটে না।

মহান ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার অবস্থাও ছিল এমন। জীবদ্দশায় মানুষ তার মর্যাদা বুঝতে পারেনি। বুঝেছে তার মৃত্যুর পরে। আর তখন গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া সবাই তার প্রশংসা করেছে। তার রচনাবলি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে,

তার অমরবাণী খ্যাতি কুড়িয়েছে দুনিয়াজুড়ে।[১]

শাইখুল ইসলামের জীবনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল হিংসুকদের হিংসা। হিংসা এমন এক মানসিক ব্যাধি, যার কবল থেকে কেউই বাঁচতে পারে না। কারণ প্রতিটি মানুষই কিছু বিশেষ নিয়ামতের অধিকারী হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই নিয়ামতের কারণেই অন্যের হিংসার শিকার হয়। সেই আদিকাল থেকেই যেহেতু মানুষের স্বভাবে হিংসার বসবাস, তাই সহজেই অনুমান করা যায়, শাইখুল ইসলামের মতো এমন বিশাল নিয়ামতের অধিকারী ব্যক্তির ব্যাপারে মানুষের হিংসা কেমন হতে পারে!

শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মালিকি মাজহাবের এক কাজির নাম ছিল ইবনু মাখলুফ। লোকটি ছিল ভীষণ হিংসুটে। সে নিছক শব্দগত মতপার্থক্যের কারণেও মুসলিমদের রক্ত ঝরানোকে জায়িয বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তার এই হীন মানসিকতা বোঝার জন্য নিচের বক্তব্যটিই যথেষ্ট—

'ইবনু তাইমিয়াকে হত্যা করা বৈধ। আমার কাছে তার কুফরি সুপ্রমাণিত।'

সে সারাজীবনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভর করে শাইখুল ইসলামের রক্ত ঝরানোর সুযোগ খুঁজেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার অনিষ্ট থেকে শাইখকে রক্ষা করেছেন। ইবনু তাইমিয়া এবং এই লোকের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।[২]

---

[১] আল-বাদরুত তালি, শাওকানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬০

কারাগারের দিনগুলো

আলো যেখানেই রাখা হোক না কেন তা দীপ্তি ছড়াবেই। তার মাধ্যমে অন্ধকার বিদূরিত হবেই; বরং তাকে যত বেশি নিকষ কালো অন্ধকারে রাখা হবে, তার আলোর বিচ্ছুরণও হবে তত বেশি শানিত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ছিলেন এক প্রোজ্জ্বল আলোর মশাল। তাকে যেখানে যেভাবেই রাখা হয়েছে, তিনি বিভা ছড়িয়েছেন। তার বিভায় অন্ধকার দূরীভূত করেছেন। তাকে কারাগারে বন্দি বা নির্বাসনে পাঠানোর কারণে তার আলোর বিভা সামান্য পরিমাণ কমেনি। বরং আরও শানিত হয়েছে। কেমন ছিল তার কারাগারের রাতদিন? চলুন একটু শুনে আসি।

ক. জিকির-আজকার

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া কারাগারকে কখনো ভয় করতেন না। বন্দিশালার কথা শুনলে এমনকি মনখারাপও করতেন না। কারাগারে যেতে হবে শুনলে তিনি বরং আনন্দিত হতেন। কারণ লোকালয়ে অবস্থান করলে কোনো না কোনো ব্যস্ততা লেগেই থাকে। মানুষকে সময় দিতে হয়। নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। ফলে ইবাদত-বন্দেগির জন্য তেমন সময় পাওয়া যায় না। আল্লাহর জিকিরে ভালোমতো নিবিষ্ট থাকার সুযোগ হয় না। অপরদিকে কারাগারে বন্দি থাকলে দুনিয়ার এসব ঝুটঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আল্লাহর সাথে নিবিড় আলাপনের সুযোগ তৈরি হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে আমি বলতে শুনেছি, 'আমার শত্রুরা আমার কীই-বা করতে পারবে? আমার জান্নাত ও বাগান তো আমার বুকেই। আমি যেখানেই যাই, তা আমার সাথেই থাকে, আমার থেকে

কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। কারাগার আমার (ইবাদতের জন্য) নির্জন আশ্রয়স্থল। মৃত্যুদণ্ড আমার জন্য শাহাদাতের সুযোগ। আর দেশ থেকে নির্বাসন আমার জন্য হিজরতস্বরূপ।'[১]

কারাবন্দি অবস্থায় তিনি বলতেন, 'আমি যদি এই কারাগার পরিমাণ স্বর্ণ দান করি তবুও এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না।'[২]

তিনি আরও বলতেন, 'কারাগারে বন্দি করে শত্রুরা আমার যে কল্যাণের ব্যবস্থা করেছে, আমি কোনোভাবেই এর প্রতিদান দিতে পারব না।'[৩]

কারাগারে বন্দি অবস্থায় তিনি সিজদায় বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার জিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদতের তাওফিক দিন।'[৪]

তিনি একবার আমাকে বলেন, 'প্রকৃত বন্দি তো ওই ব্যক্তি, যার অন্তর রবের জিকির-বিমুখ। প্রকৃত কয়েদি তো সে-ই, যার প্রবৃত্তি তাকে কয়েদ করে ফেলেছে।'[৫]

শাইখুল ইসলামকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হলে কারাগারে প্রবেশ করে কারাগারের চার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তিনি এই আয়াত পাঠ করেন—

...فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ ۢ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা থাকবে। তার ভেতর ভাগে থাকবে রহমত আর বহির্ভাগের সর্বত্র থাকবে আজাব।[৬][৭]

আমি এমন কাউকে দেখিনি যার জীবন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার জীবন থেকে বেশি উত্তম ও প্রশান্ত ছিল। অথচ বাহ্যিক জীবনোপকরণ ছিল সংকীর্ণ, তাতে ছিল না কোনো বিলাসিতার লেশমাত্র। জীবনের দীর্ঘ সময়জুড়ে তাকে

[১] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৯

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] সুরা হাদিদ, আয়াত : ১৩

[৭] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৯

কারাবরণ করতে হয়েছে, মুখোমুখি হতে হয়েছে নানা রকমের বাধাবিপত্তির। এত কিছুর পরও তার জীবনপদ্ধতি ছিল সর্বোত্তম, হৃদয় ছিল প্রশান্ত আর প্রতিজ্ঞা ছিল ইস্পাতকঠিন। চেহারায় সর্বদা লেগে থাকত অপার্থিব প্রশান্তি।

আমরা যখন ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম, আমাদের অন্তরে যখন ওয়াসওয়াসা ও কুধারণা জন্ম নিত, আমাদের জীবন যখন হয়ে উঠত সংকীর্ণ, তখন আমরা তার কাছে ছুটে যেতাম। তাকে দেখা ও তার কথা শোনা মাত্রই রাজ্যের ভয়ভীতি, ওয়াসওয়াসা, কুধারণা ও সংকীর্ণতা আমাদের থেকে দূর হয়ে যেত। আমাদের মাঝে তখন প্রশান্তি, প্রশস্ততা, মনোবল, ইয়াকিন ও প্রফুল্লতা ছড়িয়ে পড়ত।

সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি তাঁর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাঁর বান্দাকে জান্নাত দেখিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছেন। সেই দরজা দিয়ে তার কাছে আসত জান্নাতের স্বাদ, ঘ্রাণ ও মৃদুমন্দ সমীরণ।[১]

বন্দি অবস্থায় তার ইবাদত-বন্দেগি সম্পর্কে হাফিজ ইবনু আব্দিল হাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার কাছ থেকে কিতাবাদি ও কাগজ-কলম ছিনিয়ে নেওয়া হলে তিনি ইবাদত-বন্দেগি, তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও তাহাজ্জুদে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। মৃত্যু অবধি তিনি এভাবেই সময় কাটাতেন।

মৃত্যুর পূর্বে যখন তাকে কিল্লায় বন্দি করা হয়, তখন তিনি ৮০ বা ৮১ বার কুরআন খতম করেন। শেষবার তিনি সুরা কামারের শেষ পর্যন্ত তথা এই আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন—

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝٥٤ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥

নিশ্চয় মুত্তাকিরা বাগান-সমূহ ও ঝরনায় অবস্থান করবে। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর নিকটে।[২]

তিনি প্রতিদিন তিন পারা করে তিলাওয়াত করতেন। এভাবে প্রতি ১০দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন।[৩]

---

[১] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৯-১১০

[২] সুরা কামার, আয়াত : ৫৪-৫৫

[৩] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৪২৮

খ. অধ্যয়ন

আমরা পূর্বেই দেখেছি শৈশব থেকেই শাইখুল ইসলাম ছিলেন প্রচণ্ড ইলমপিপাসু। অধ্যয়ন ছিল তার জীবনের অন্যতম ব্রত। তার হৃদয়ের স্পন্দন ছিল পড়ালেখা আর অধ্যয়ন। কারাবন্দি অবস্থাতেও তার অধ্যয়ন ও গবেষণায় ভাটা পড়েনি। বরং কারাগারের নিভৃত জীবনকে তিনি অধ্যয়ন ও গবেষণার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুযোগ মনে করতেন। তাতে তিনি তৃপ্তি খুঁজে পেতেন। এ বিষয়টি বিদিত ছিল তার শত্রুদের কাছেও। কারাগারে বন্দিদেরকে বিভিন্ন দৈহিক শাস্তি দেওয়া হলেও তারা তাকে দৈহিক শাস্তি না দিয়ে তার কিতাবাদি ও অধ্যয়নের সরঞ্জামাদি ছিনিয়ে নিত। এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এর কয়েক মাস পরেই তিনি নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করেন।[১]

গ. লেখালেখি

শাইখুল ইসলামের জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ কেটেছে লেখালেখির পেছনে। ইসলামের সকল শাখায় ছিল তার অসাধারণ দক্ষতা। তুমুল জনপ্রিয় এবং ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক হওয়ার কারণে দিনের বেশিরভাগ সময় তার কেটে যেত অধ্যাপনা আর মানুষকে সময় দেওয়ার মধ্য দিয়েই। লেখালেখির জন্য নিবিড় নির্জনতা খুব একটা হয়ে উঠত না।

শাইখুল ইসলাম তাই কারাজীবনকে লেখালেখির একটা সুযোগ মনে করতেন। সেই সময়টায় ডুবে থাকতেন লেখালেখিতে। লেখার জন্য চাই একেবারে নিরালা ও নিভৃত জায়গা। আর কারাগার ছিল এর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। শাইখুল ইসলাম এই সুযোগ শতভাগ কাজে লাগাতেন। তিনি তার একাধিক গ্রন্থ কারাগারে লিখেছেন। আমরা আগেই দেখেছি তিনি মালিকি কাজি আব্দুল্লাহ ইবনু আখিন্নায়ির খণ্ডনমূলক কিতাব জেলখানায় লেখেন। তার অমরকীর্তি আস-সারিমুল মাসলুল গ্রন্থ লেখেন জেলখানায়। কারাজীবনকে তিনি কীভাবে রচনার কাজে ব্যবহার করতেন, তা বোঝা যায় হাফিজ বিরযালি রাহিমাহুল্লাহর কথা থেকেও। তার বর্ণনা অনুযায়ী দামেশকের কারাগারে যখন তার কাছ থেকে কিতাবাদি ও কাগজ-কলম ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তখন তার কাছে ৬০ খণ্ড পাণ্ডুলিপি এবং ১৪ বান্ডিল খাতা ছিল।[২]

কারাগারে লেখালেখির কাজে তিনি তৃপ্তি খুঁজে পেতেন। তার শত্রুরাও তার এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝত। তাই শাস্তিস্বরূপ তারা তার কাছ থেকে কাগজ-কলম কেড়ে নেয়। কাগজ-কলম কেড়ে নেওয়াটা ছিল শাইখুল ইসলামের জীবনের সবচেয়ে বড়

---

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৪২৫

[২] প্রাগুক্ত

ধাক্কা। তিনি মর্মাহত হন। মানসিকভাবে অত্যন্ত পীড়িত হন। এই মানসিক পীড়া থেকে বাঁচতে তিনি তার হাতের কাছে যা পেতেন, তা দিয়েই লিখতে শুরু করতেন। লিখতেন কয়লা দিয়েও। কিন্তু কোনো কিছুতেই তিনি আর মানসিকভাবে প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তার মানসিক নির্যাতন বরং বেড়েই চলছিল। কাগজ-কলম কেড়ে নেওয়াটা তার কাছে প্রাণ হরণের চেয়েও বেদনাদায়ক ছিল। এই ঘটনার মাত্র ৫ মাস ১৩ দিন পর তিনি নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে রবের সান্নিধ্যে চলে যান।

ঘ. দাওয়াতি কার্যক্রম, ফতোয়া প্রদান ও দারস-তাদরিস

একজন দাঈর দাওয়াতি কার্যক্রম কখনোই থেমে থাকে না। যখন যেখানে যেভাবেই থাকেন—পরিস্থিতি যেমনই হোক—তিনি তার দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যান। কোনো স্থান বা কালের সাথে সে দাওয়াত সীমাবদ্ধ নয়; সবসময় সবখানেই সে দাওয়াতের বাণী থাকে চলমান। সাইয়িদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় তার দাওয়াত চালিয়ে যান। বন্দিদের তাওহিদের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এক্ষেত্রে ছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারী। তিনিও জেলখানায় চালিয়ে যান দাওয়াতি কার্যক্রম।

তিনি জেলখানায় বন্দি থাকলেও লোকজন তার কাছেই ছুটে আসত। দৈনন্দিন জীবনে যেসমস্ত জটিলতার ও সমস্যার সম্মুখীন তারা হতো, তার কাছ থেকে সেসবের সমাধান জানতে চাইত। তিনিও তাদের সেসব সমস্যার সমাধান স্পষ্ট করতেন এবং সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। তৎকালীন ফকিহ, আমির-উমারা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেসব মাসআলা-মাসাইলের সমাধান দিতে ব্যর্থ হতেন, তিনি জেলে বসেই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সেসবের এমনভাবে সমাধান দিতেন যে তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। শুধু মৌখিক নয় লিখিত আকারেও তিনি মাসআলা-মাসাইলের জবাব দিতেন জেলে থেকেই।[১]

জেলখানার জীবন মানে এক বিশৃঙ্খল জীবন। সেখানে আসামিদের মাঝে সাধারণত কোনো নিয়ম-কানুন থাকে না। তারা যে যেভাবে পারে সেভাবে সময় কাটায়। শাইখুল ইসলাম জেলখানায় প্রবেশ করে আসামিদের এই অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পান। এত মূল্যবান সময় তারা এভাবে বিভিন্ন খেল-তামাশা ও গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিচ্ছে দেখে তার মাঝে বিষণ্ণতা ভর করে। তিনি ভাবতে থাকেন এদেরকে এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তাদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। এভাবে অযথা সময় না কাটিয়ে জিকির-আজকার এবং ইবাদত-বন্দেগিতে সময় কাটানোর

[১] সিরাতু শাইখিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৩৩২

জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করেন। এমনকি প্রাত্যহিক দারসের ব্যবস্থা করেন। কেমন ছিল তার দাওয়াতি কার্যক্রম? চলুন শুনে আসি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ছাত্র ইমাম ইবনু আব্দিল হাদি রাহিমাহুল্লাহর মুখ থেকে। তিনি বলেন—

ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে জেলখানায় বন্দি করা হলে তিনি দেখেন যে, আসামিরা বিভিন্ন রকম খেলতামাশা ও আমোদ-প্রমোদে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে, যেমন—তাস খেলা, দাবা খেলা, পাশা খেলা ইত্যাদি। এমনকি সালাতের দিকেও তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

এ অবস্থা দেখে শাইখুল ইসলাম খুবই ব্যথিত হন। সালাতের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করেন। নেক আমলে তাদেরকে অভ্যস্ত করেন। কীভাবে আল্লাহমুখী হতে হয়, তার প্রশিক্ষণ দেন। তাসবিহ পাঠ, জিকির-আজকার, ইস্তিগফার, দুআ-সহ অন্যান্য নেক আমলে তাদেরকে ব্যস্ত করে তুলেন। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় নানান বিষয়ে সুন্নাহ-ভিত্তিক জ্ঞান দান করেন। এভাবে একপর্যায়ে সে-জেলখানা দ্বীনি শিক্ষালয়ে রূপ নেয়। অনেক দ্বীনি মজলিস, মাদরাসা, খানকা ইত্যাদির চেয়ে সেখানে দ্বীনের চর্চা বেশি হতে থাকে। ফলে শাইখুল ইসলামের সাহচর্যে থেকে দ্বীনি জ্ঞানার্জনের আশায় অনেক আসামি জেল থেকে মুক্তি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি অসংখ্য মুক্ত আসামি আবার জেলখানায় ফিরে আসে। এভাবে জেলখানা কানায় কানায় ভরে যায়।[১]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখুল ইসলামের সাথী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা প্রথম প্রথম গোপনে তার কাছে প্রবেশ করত। পরবর্তীতে প্রকাশ্যেই তারা তার কাছে প্রবেশ করতে শুরু করে।[২]

[১] আল-উকুদুদ দুররিইয়াহ, পৃষ্ঠা : ৩৩০-৩৩১

[২] যাইলু তবাকাতিল হানাবিলাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৯

জীবন সায়াহ্নে

শেষবার বন্দি থাকাকালে শাইখুল ইসলাম ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতা একদিকে তার কারামুক্তির কারণ হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তার জীবনীশক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। এই অসুস্থতার পর তিনি আর পূর্ণাঙ্গ সুস্থ হননি। সেবার তার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ার পেছনে শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল প্রচণ্ড মানসিক চাপ। কারণ সেসময় শাইখের কাছ থেকে সবধরনের কিতাবপত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। লেখার কাগজ-কলম পর্যন্ত রাখতে দেওয়া হয়নি। তিনি কালি দিয়ে কাপড় আর ইট-পাথরের ওপর লেখালেখি করতেন।[১] একজন আলিম ও সংস্কারকের জন্য এই কষ্ট মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। এই রূঢ় পরিবেশ তার অন্তরে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে।

একজন মুমিন কখনো হতাশ হতে পারে না। তিনিও হননি। কারাভোগের পুরো সময়টিতেই কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে হৃদয়কে প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন। সেসময় প্রতি ১০ দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। শাইখুল ইসলামের ভাই যাইনুদ্দিন আব্দুর রহমান বলেন, পবিত্র কুরআন মাজিদ ৮০ বার খতম করার পর যখন তিনি পরবর্তী খতমের উদ্দেশ্যে নতুন করে তিলাওয়াত শুরু করেন এবং সুরা কামারের নিচের আয়াতটিতে পৌঁছেন—

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ۝٥٤ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ ۝٥٥

নিশ্চয় মুত্তাকিরা বাগান-সমূহ ও ঝরনায় অবস্থান করবে। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর নিকটে।[২]

[১] *আশ-শাহাদাতুয যাকিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৬৬

[২] সুরা কামার, আয়াত : ৫৪-৫৫

তখন আমার পরিবর্তে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহিব ও আব্দুল্লাহ আয-যুরআর সঙ্গে দাওর[১] শুরু করেন। তারা দুজন ছিলেন সহোদর ভাই আর দুজনেই ছিলেন খুব ভালো মানুষ। শাইখ তাদের কিরাআত খুবই পছন্দ করতেন। এই নতুন দাওর শেষ হওয়ার আগেই তার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে।[২]

মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হতেই দামেশকের শাসনকর্তা তাকে দেখতে আসেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি মাফ চাইতে শুরু করেন। বলেন, আমার দ্বারা কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে থাকলে কিংবা আমার কারণে আপনি কষ্ট পেয়ে থাকলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করবেন। জবাবে শাইখ বলেন, 'আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে ক্ষমা করেছি। তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি, যারা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। আসলে আমি যে সত্যের ওপর আছি, তারা তা জানে না। সুলতান মুআজ্জাম আল-মালিকুন নাসিরের বিরুদ্ধেও আমার কোনো অভিযোগ নেই। কেননা তিনি নিজের ইচ্ছা থেকে আমাকে বন্দি করেননি; বরং আলিমদের প্রতি আস্থা ও আনুগত্যের কারণেই এ কাজ করেছেন। এজন্য আমি তাকে মাজুর মনে করি। আমার পক্ষ থেকে আমি সবাইকেই মাফ করে দিয়েছি; কেবল তাদেরকে নয়—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দুশমন।'[৩]

মৃত্যু

মৃত্যুর ২০ থেকে ২২ দিন আগে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর এ অবস্থায় ৭২৮ হিজরির ২২শে জিলকদ সোমবার রাতে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আখিরাতের পথে যাত্রা শুরু করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।[৪]

মুয়াজ্জিন দুর্গের মিনারে চড়ে শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেন। বুরুজে পাহারারত চৌকিদার সেই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। বিদ্যুৎ বেগে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। শহরজুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। আত্মীয়স্বজন, সঙ্গীসাথি-সহ পরিচিত-অপরিচিত সবাই দলে দলে এসে তাকে এক নজর দেখতে ভিড় জমায়। সবার জন্য দুর্গের দরজা খুলে দেওয়া হয়। দুর্গের ফটক থেকে শুরু করে রাস্তা পর্যন্ত সবখানে মানুষের ঢল নামে। জামে দামেশকে তিল ধারণের ঠাঁইটুকুও বাকি থাকে না। সেদিন মানুষের অশ্রু বিসর্জন দেখে মনে হচ্ছিল যেন এরচেয়ে বিষাদময় কোনো দিন তাদের জীবনে আর আসেনি। শাইখের মরদেহ জিয়ারত করে

---

[১] একে অপরকে কুরআন মুখস্থ শোনানো।

[২] *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২৭

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত

অনেকেই ভালোবেসে তার কপালে চুমু খাচ্ছিল। যে কপাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহান আল্লাহর সামনে সিজদাবনত থেকেছে, সে কপালে চুমু খাওয়াও তো সৌভাগ্যের।[১]

জিয়ারত শেষ হলে গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এর আগেই তার কাছে কয়েকজন বসে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করে। গোসলের সময় গোসলের কাজে নিয়োজিত লোকদের ছাড়া বাকিদের সরিয়ে দেওয়া হয়।[২]

জানাযা ও দাফন

গোসল প্রদানের পর প্রথম জানাযার সালাত দুর্গের ভেতরেই অনুষ্ঠিত হয়। শাইখ মুহাম্মাদ তামিম জানাযা পড়ান। জানাযার পর খাটিয়া বাইরে আনা হয়। দুর্গ ও জামে মসজিদের মধ্যবর্তী সকল রাস্তা ছিল লোকে লোকারণ্য। যুহরের সময় জানাযা জামে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। ভিড়ের চাপ এত বেশি ছিল যে, সৈন্যদের দ্বারা খাটিয়া ঘিরে রাখতে হয়। তা নাহলে কোনোভাবেই জানাযার হিফাজত বা ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছিল না। শাইখের জন্য ঠিক কত লোক রাস্তায় নেমে এসেছিল, সে সংখ্যা অনুমান করাও ছিল দুষ্কর। হঠাৎ জনতার ভিড়ে থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলে ওঠে—

ইমামুস সুন্নাহর জানাযা এমনই হয়ে থাকে।

এ কথা শুনে মানুষের বুকে জমে থাকা ব্যথা যেন অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসে। লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বাদ যুহর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জনতার ভিড় ক্রমেই বাড়ছিল। পথপ্রান্তর, গলিঘুপচি, বাজারঘাট সব কানায় কানায় ভরে যায়। যেদিকে চোখ যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। ব্যবসায়ীরা দোকানপাট সব বন্ধ করে দেয়। খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ না থাকায় অনেকেই সিয়ামের নিয়ত করে নেয়।

জানাযা আদায়ের পর আবার খাটিয়া তোলা হলো। কিন্তু তা কাঁধে বহন করে নেওয়ার অবস্থা ছিল না। লোকের হাতে হাতে এবং মাথায় মাথায় তা অগ্রসর হচ্ছিল। চারদিক থেকে কান্না আর আহাজারির আওয়াজে বাতাস ভারী হয়ে ছিল। দুআ গুঞ্জরিত হচ্ছিল শহরজুড়ে। সবাই তার প্রশংসায় ছিল মুখরিত। সবাই খাটিয়া স্পর্শ করতে চাইছিল। কেউ কেউ রুমাল বা কাপড় ছুড়ে খাটিয়া স্পর্শ করার চেষ্টা

[১] প্রাগুক্ত

[২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৪০

করছিল। ভিড়ের চাপে কার জুতা-চপ্পল যে কোথায় ছিটকে পড়ছিল তার কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। মাথার রুমাল এবং পাগড়িরও ছিল একই অবস্থা। শাইখের খাটিয়াকে এক নজর দেখা ও তার মৃতদেহের সাথে চলার জন্য মানুষ এত বেশি নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, নিজের কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্রের দিকে কারও কোনো খেয়াল ছিল না। মাথার ওপর দিয়ে খাটিয়া গড়িয়ে চলছিল। কখনো খুব দ্রুতগতিতে; কখনো বা মন্থর গতিতে ধীরে সুস্থে। ঘোড়াহাটিতে পৌঁছুলে লোকসংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সেখানেই খাটিয়া নামিয়ে রাখা হয়। শাইখের ছোট ভাই যাইনুদ্দিন আব্দুর রহমান সামনে এগিয়ে আসেন। তিনিই জানাযা পড়ান। এরপর আস-সুফিয়া গোরস্থানে ইমামের ভাই শারফুদ্দিন আব্দুল্লাহর পাশে তাকে দাফন করা হয়।

খাটিয়া দুর্গ থেকে বেরিয়ে ছিল ভোরবেলায়; অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে সমাধিস্থলে পৌঁছাতে আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আজানের ঠিক আগ মুহূর্তে দাফন করা সম্ভব হয়। গোটা শহরই তার খাটিয়ার সাথে যাত্রা করেছিল। উপস্থিত লোকের সংখ্যা ৬০ হাজার থেকে ১ লাখের মতো হবে বলে অনুমান করা হয়। তাদের মধ্যে ১৫ হাজারের মতো মহিলাও ছিল। এছাড়া বিভিন্ন বাড়ি-ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ ও দর্শকের কথা বিবেচনা করলে এ সংখ্যা অনুমান করাও মুশকিল হয়ে যাবে। দামেশকের ইতিহাসে কোনো জানাযায় এত বেশি জনসমাগম আর কখনো দেখা যায়নি। এমনকি বনি উমাইয়ার শাসনামলে যখন দামেশকের জনবসতি বেশি ছিল তখনো এমন জনসমাগম হয়নি।

শহরের যাদের পক্ষে জানাযায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল, তাদের কেউ সেদিন বাকি ছিল না, প্রত্যেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট, দৈনন্দিন কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শাইখের মৃত্যু যেন মানুষকে সবকিছু থেকে বিমুখ করে দিয়েছিল।[১]

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৪১-১৪৫; *শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ : রাজুলুল ইসলাহ ওয়াদ দাওয়াহ*, ইবরাহিম মুহাম্মাদ আল-আলি, পৃষ্ঠা : ৩১৬-৩২০

শাইখুল ইসলামের পানাহার

হাফিজ বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন স্বপ্নে দেখি, নির্জন এক বারান্দায় বসে শাইখ ইবনু তাইমিয়ার সঙ্গে খাবার খাচ্ছি। তখনো তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এরপর ভাগ্যক্রমে একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি আমাকে দস্তরখানে বসার আমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রণ পেয়ে সবার সঙ্গে আমিও খেতে বসি। স্বপ্নে তাকে যে খাবার যতটুকু খেতে দেখেছিলাম, বাস্তবেও ঠিক তা-ই হলো।[১]

আমি একাধিক লোকের কাছ থেকে শুনেছি, তারা ইবনু তাইমিয়াকে কখনো রাতের বা সকালের খাবার খেতে দেখেননি। অনেক সময় দেখা যেত, তাকে খাবার দেওয়া হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তিনি সেদিকে ফিরে তাকানোরও সুযোগ পাননি। আর তিনি খুব সামান্যই খেতেন।[২]

বাযযার রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, আমরা তাকে কখনো দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ নিয়ে কথা বলতে দেখিনি; কোনো দুনিয়াবি আলোচনায় মত্ত থাকতে দেখিনি। তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল আখিরাত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা।[৩]

আল্লামা সাফাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি, একদিন ইবনু তাইমিয়ার মা মিষ্টিকুমড়া রান্না করেন। রান্না করার সময় লবণ চাখতে মনে ছিল না। পরে খেয়ে দেখেন, তেতো হয়ে গেছে। তেতো কুমড়া খেতে না

---

[১] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৫১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫২

পেরে সেভাবেই রেখে দেন। কিছুক্ষণ পর ইবনু তাইমিয়া এসে জিজ্ঞেস করেন, মা, ক্ষুধা লেগেছে। খাওয়ার কিছু আছে? মা উত্তর দেন, না তেমন কিছু নেই। তবে একটা কুমড়া রান্না করেছিলাম; সেখানে লবণ বেশি হয়ে গেছে। ইবনু তাইমিয়া বলেন, কোথায় সেটা? মা হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দেন। ইবনু তাইমিয়া কোনো ধরনের মন্তব্য না করে সেই তেতো কুমড়াই তৃপ্তি-সহকারে খেয়ে ওঠেন।[১]

[১] আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফাইয়াত, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৬

শাইখুল ইসলামের প্রশংসায় আলিমগণ

হাফিজ যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু তাইমিয়া যখন শাইখ তাকিউদ্দিন ইবনু দাকিকিল ইদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার মজলিসে বসে হাদিস শোনেন, তখন ইবনু দাকিকিল ইদ মন্তব্য করেন, 'আমি ধারণাও করিনি যে, আল্লাহ আজও তোমার মতো মানুষ সৃষ্টি করেছেন।'[১]

» হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি বলেন, হাফিজ আবুল হাজ্জাজ মিযযি রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলামকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন, 'গত চার শতাব্দীতে তার মতো কাউকে দেখা যায়নি।'

» শাইখ আবুল হাজ্জাজ বলেন, 'আমি তার মতো কাউকে দেখিনি, তিনি নিজেও তার মতো কাউকে দেখেননি। কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও অনুসরণে আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে দেখিনি।'

» ইবনু যামলাকানি রাহিমাহুল্লাহ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একবার তাকে শাইখের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি উত্তর দেন, 'গত পাঁচ শতাব্দীতে তার মতো কাউকে দেখা যায়নি।'[২]

তার ভাই শাইখ শারফুদ্দিনও তাকে অনেক সম্মান করতেন। আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু কাওয়ামের মতো পরিচিত শাইখগণও তাকে সমীহ করতেন। আবু আব্দিল্লাহ ইবনু কাওয়াম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাদের সমস্ত জ্ঞান ইবনু

---

[১] *আশ-শাহাদাতুয যাকিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ২৯

[২] *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৩

তাইমিয়ার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।'

শাইখ ইমাদুদ্দিন আল-ওয়াসিতি শাইখকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বয়সে বড় হয়েও তিনি শাইখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'শাইখুল ইসলামের মর্যাদা বড় ইমামদের কাছাকাছি। শুধু তা-ই নয়; কোনো কোনো বিষয়ে তার অবস্থান সিদ্দিকদের কাতারে।'

শাইখ ইমাদুদ্দিন একটি পত্রে ইবনু তাইমিয়ার বিশিষ্ট শিষ্যদের উদ্দেশে বলেন, 'বহু অঞ্চলের বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে; কিন্তু ইলমে-আমলে এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে, ব্যক্তিগত বিষয়ে সহনশীলতা ও আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় লঙ্ঘনের প্রতিবাদে তার মতো কাউকে দেখিনি।' এ বক্তব্যের ব্যাপারে তিনি তিনবার কসম করেন।

তারপর বলেন, 'চুক্তি পালনে তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী। ইলম ও দৃঢ় সংকল্পে তিনি সদা তৎপর। সত্যের সাহায্য ও বাস্তবায়নে সবার ওপরে তার অবস্থান। তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় দানবীর। নবিজির একান্ত অনুসারী। আমরা আমাদের যুগে এই মহান ব্যক্তিকে কথায় ও কাজে, মুহাম্মাদি নবুয়ত ও তার আদর্শকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে দেখেছি, আমাদের হৃদয় সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, একেই বলে দ্বীনের প্রকৃত অনুসরণ।'[১]

» শাইখ ইবরাহিম আররাকি বলেন, 'শাইখ তাকিউদ্দিন ইবনু তাইমিয়ার কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করতে এবং তাকে অনুসরণ করতে কোনো বাধা নেই। তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করলে গোটা পৃথিবী জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে তুলবেন। তিনি হকের ওপর থাকলেও মানুষ তার বিরোধিতা করবে। কারণ তিনি ইলমে নববির উত্তরাধিকারী।'

» প্রধান বিচারপতি আবু আব্দিল্লাহ ইবনুল হারিরি বলেন, 'ইবনু তাইমিয়া যদি শাইখুল ইসলাম না হন, তবে আর কে হবে?'

আল্লামা ইবনুল ওয়ারদি দামেশকের আলিমদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'গোঁড়ামি ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ছেড়ে একবার ইবনু তাইমিয়ার মজলিসে বসেছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন কবিতার পঙ্‌ক্তি; নিখুঁত কোনো মুক্তোদানা। সমসাময়িক আলিমগণ—সবাই যেন তার কক্ষপথ; আর তিনি হলেন কেন্দ্রবিন্দু; তারা যেন একটি দেহ, আর তিনি সে দেহের হৃদয়। তাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব যেন চাঁদের ওপর সূর্য কিংবা এক ফোঁটা পানির ওপর সমুদ্রের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। তার একদিনের আলোচনা শুনেই আমার এই অনুভূতি হয়েছে। আমার চোখের পর্দা সরে

[১] আত-তাযকিরাহ ওয়াল ইতিবার, পৃষ্ঠা : ৩৭

গেছে। স্বগতোক্তির মতো করে আমি বলে উঠেছি—

'ইবনু তাইমিয়া ইলমের সকল শাখায় অতুলনীয়।

হে আহমাদ! তুমি আহমাদের দ্বীন ও শরিয়তকে নতুন জীবন দিয়েছ।'[১]

» আবুল বাকা আস-সুবকি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! মূর্খ কিংবা প্রবৃত্তির অনুসারী লোকেরা ছাড়া কেউ ইবনু তাইমিয়াকে অপছন্দ করতে পারে না। কারণ মূর্খ কী বলে, তা সে নিজেই জানে না, আর প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি সত্য জানার পরও তার প্রবৃত্তি তাকে সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।'[২]

» আল্লামা ইবনু দাকিকিল ইদ বলেন, 'ইবনু তাইমিয়াকে দেখে আমার মনে হয়েছে, তার সামনে দুনিয়ার যাবতীয় ইলমের পসরা সাজিয়ে রাখা হয়েছে; তিনি সেখান থেকে ইচ্ছেমতো গ্রহণ করছেন কিংবা বাদ দিচ্ছেন।'[৩]

» হকের প্রশ্নে ইবনু তাইমিয়া নিন্দুকের নিন্দায় দমবার পাত্র ছিলেন না। তার কাছে তোষামোদের স্থান ছিল না। প্রশংসা বা নিন্দা তাকে প্রভাবিত করতে পারত না।

» কামালুদ্দিন ইবনুয যামলাকানি বলেছেন, 'শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে যখন কোনো শাস্ত্রের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন দর্শক-শ্রোতাদের মনে হতো, তিনি সেই শাস্ত্রের ব্যাপারেই সবচেয়ে ভালো জানেন। উপস্থিত সবাই ঘোষণা করত, এ শাস্ত্রে তার মতো আর কারও জানা নেই। যেকোনো মাজহাবের ফকিহ তার সান্নিধ্যে এলে, নিজেদের মাজহাবের নানা তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করে উপকৃত হতেন। ইলমি তর্কে লিপ্ত হয়ে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছেন, এমন কথা শোনা যায়নি। ধর্মীয় কিংবা জাগতিক; জ্ঞানের যে বিষয়েই তিনি কথা বলতেন, তার কথার স্থানই হতো সবার ঊর্ধ্বে। ইজতিহাদের প্রতিটি শর্তের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল তার মাঝে।'[৪]

---

[১] *তারিখু ইবনিল ওয়ারদি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৭

[২] *আশ-শাহাদাতুয যাকিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৫৮

[৩] *আশ-শাহাদাতুয যাকিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ২৯

[৪] *আল-উকূদুদ দুররিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৭-৮

শাইখুল ইসলামের রচনা ও গবেষণা

হাফিজ যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি তাফসির, ফিকহ, উসুল, দর্শন ও দর্শনের খণ্ডনে দৈনিক প্রায় আট পৃষ্ঠা কিংবা তারও বেশি লিখতেন। এখন পর্যন্ত তার রচনা ৫শ খণ্ডে পৌঁছেছে। একাধিক মাসআলা বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তার ফতোয়া, উসুল, মূলনীতি, উত্তরপত্র এবং ছোট ছোট পুস্তিকার বিশাল সৃষ্টিকর্ম রয়েছে, যেগুলো এখনো বিন্যস্ত করা হয়নি।'[১]

রচনা ও গবেষণাই ছিল তার জীবন প্রধান ব্যস্ততা। বিশাল রচনাসম্ভারের সিংহভাগই তিনি লিখেছেন স্মৃতির ওপর নির্ভর করে। আবার অনেক কিতাব রচনা করেছেন কারাগারে বসে।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার কথায়, লেখায়, উদ্যোগ ও কর্মপন্থায় আমি এক অদ্ভুত শক্তি দেখতে পেয়েছি। একজন লেখক এক সপ্তাহে যতটুকু লিখতে পারে, তিনি একদিনেই ততটুকু লিখতেন।'[২]

আসমাউ মুআল্লাফাতি ইবনি তাইমিয়ায় তার কিতাবের যে তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে রচনার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩০টি। এর মাঝে অধিকাংশ লেখাই *মাজমুউল ফাতাওয়া* গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। *মাজমুউল ফাতাওয়া* ৩৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলামের কিতাবসমূহের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হলো—

---

[১] *তারিখু ইবনিল ওয়ারদি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৬-৪০৭

[২] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃষ্ঠা : ১৪০

১. আল-ঈমানুল কাবির : এ কিতাবে ঈমান, ঈমানের হাকিকত, ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য, ঈমানের দাবি ও ঈমান-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *মাজমুউল ফাতাওয়া* সংকলনের পর এ কিতাবটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ২০১৩ সালে কিতাবটি দারুল আসিমা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. তালবিসুল জাহমিয়া ফি তা'সিসি বিদায়িহিমিল কালামিয়াহ (৬ খণ্ড) : এই কিতাবে তিনি কালাম ও দর্শনশাস্ত্রবিদদের সমালোচনা করেছেন এবং দর্শনের বিভিন্ন বক্তব্য; বিশেষত জাহমিয়াদের[১] আকিদা ও বিশ্বাস খণ্ডন করেছেন। ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার *আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া* গ্রন্থে বলেন, 'ইবনু তাইমিয়ার *তা'সিস* গ্রন্থটিও আল্লাহওয়ালা আলিমদের বিস্ময়ের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।'

৩. দারউ তাআরুযিল আকলি ওয়ান নাকলি (৪ খণ্ড) : দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদ ফখরুদ্দিন রাজির *আল-কানুনুল কুল্লি* এবং হাদিস ও যুক্তি সাংঘর্ষিক হলে যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার মতবাদ খণ্ডন করে শাইখুল ইসলাম এই কিতাবটি রচনা করেন। শাইখের জীবদ্দশায়ই এই কিতাবটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ এই কিতাবের ব্যাপারে বলেন, 'আলোচ্য বিষয়ে এটি নজিরবিহীন একটি কিতাব। লেখক এই কিতাবে বাতিলপন্থিদের ভিত্তিমূলে সজোরে আঘাত করেছেন। তার বক্তব্যের সামনে তাদের মিথ্যা মতবাদ মুখ থুবড়ে ধসে পড়েছে। তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার অলীক প্রাসাদকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদিসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং ক্রমেই তা সমুন্নত করে তুলেছেন।

এই কিতাবে মতবাদ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করেছেন। ফলে কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তির নিরিখে তো বটেই; স্বভাবজাত বুদ্ধিবিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকেও হক সুসাব্যস্ত হয়েছে। সেই সাথে কিতাবটিও হয়ে উঠেছে সবার জন্য অবশ্যপাঠ্য। আল্লাহ তাআলা আহলে ইলম ও ঈমানের পক্ষে কলম ধরার জন্য লেখককে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।'

৪. আল-উবুদিইয়াত : শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'ইবাদত কী? ইবাদত কত প্রকার? সামগ্রিকভাবে ইবাদত কি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত? উবুদিইয়াত বা দাসত্বের বাস্তবতাই বা কী?' এমন আরও কিছু প্রশ্নের উত্তরে শাইখুল ইসলাম কিতাবটি রচনা করেন। এ কিতাবে তিনি অন্তরের আমলসমূহ

---

[১] জাহমিয়া একটি ভ্রান্ত দল। এরা আল্লাহ তাআলার সকল গুণাবলি অস্বীকার করে। কুরআনকে সৃষ্ট মনে করে। এ ছাড়াও এদের আরও অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে, যা কুরআন-সুন্নাহর সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, শাহরাস্তানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৬; *মাকালাতুল ইসলামিইয়িন*, আবুল হাসান আশআরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৪]

উল্লেখ করেছেন, তুলে ধরেছেন আল্লাহর দাসত্বের স্বরূপ ও বাস্তবতা। এরই মধ্য দিয়ে তিনি সুফিবাদী, কাদরিয়া[১] ও অন্যান্য বিদআতিদের ভ্রান্ত বক্তব্য খণ্ডন করেন এবং তাদের আরোপিত সন্দেহের অবসান ঘটান। কিতাবটিতে তিনি কুরআন, হাদিস ও নির্ভরযোগ্য সালাফদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এছাড়া আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের কিতাব থেকেও অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন।

৫. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিইয়া ফি নাকদি কালামিশ শিয়িইয়া ওয়াল কাদরিইয়াহ (৪ খণ্ড)

সাধারণত এই কিতাবটিকে শাইখুল ইসলামের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব মনে করা হয়। এই কিতাবে তিনি 'ইসনা আশারিয়া শিয়া'[২] ও 'কাদরিয়া' ফেরকার খণ্ডন করেছেন।

৬. আর-রিসালাতুদ তাদমুরিইয়া : এই কিতাবটিতে প্রধানত তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তাকদির বিষয়েও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

৭. আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসিহ (২ খণ্ড) : বিকৃত খৃষ্টধর্মের খণ্ডনে লিখিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব এটি। এই কিতাবে শাইখুল ইসলাম ইঞ্জিল বিকৃতির দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। কিতাবের শেষে শাইখুল ইসলাম বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে যুগে যুগে যত নবি এসেছেন, সবার দ্বীনই এক। তারা সবাই ছিলেন ভাই ভাই; আল্লাহর একত্ববাদের দিকে তারা দাওয়াত দিয়েছেন এবং শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'ইঞ্জিলেও এই সুসংবাদ রয়েছে।'

৮. আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ও আউলিয়াইশ শাইতান : এই কিতাবে আল্লাহর প্রকৃত ওলি ও শয়তানের সাহায্য গ্রহণকারী ভণ্ড পিরদের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল : এই কিতাবে চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—**এক.** যে আল্লাহর রাসুলকে গালি দেবে, সে মুসলিম হোক কিংবা কাফির; তাকে হত্যা করা হবে। **দুই.** জিম্মি হলেও মৃত্যুদণ্ডই হবে তার শাস্তি এবং তার প্রতি কোনোরূপ অনুগ্রহ করা যাবে না। **তিন.** নবিজিকে গালি

---

[১] একটি ভ্রান্ত দলের নাম কাদরিয়া। এরা তাকদিরকে অস্বীকার করে। [দেখুন, *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ*, আল-লালাকায়ি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫২; *শারহুল আকিদাতিত তহাবিয়া*, ইবনু আবিল ইয আল-হানাফি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮]

[২] এটা শিয়াদের উগ্র একটা দল। কুফরিতে ভরা এদের আকিদা। [দেখুন, *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, শাহরাস্তানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৪]

দিয়েছে এমন ব্যক্তি যদি তাওবা করে তার হুকুম কী হবে? চার. গালির ব্যাখ্যা এবং গালি দেওয়া ও কুফরির মাঝে পার্থক্য। এই কিতাব রচনার কারণ ও প্রেক্ষাপট পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম ফির রাদ্দি আলা আসহাবিল জাহিম : এই কিতাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত কিতাবটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদিস 'মান তাশাব্বাহা বি কওমিন ফাহুয়া মিনহু'[১]—এর ব্যাখ্যাস্বরূপ রচিত হয়েছে।

১১. রাফউল মালাম আন আয়িম্মাতিল আলাম : সালাফে সালিহিন; বিশেষত আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের ওপর যেসব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, শাইখুল ইসলাম এই কিতাবের মাধ্যমে তার দালিলিক জবাব দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ একাধিক মাজহাবে বিভক্ত হওয়ার কারণ মাজহাব-কেন্দ্রিক গোঁড়ামি, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমামদের যথাসাধ্য চেষ্টা ব্যয় করার পরও কেন তাদের ত্রুটি হয়েছে, সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ কিতাবে।

১২. আস-সিয়াসাতুশ শারইয়াহ ফি ইসলাহির রায়ি ওয়ার রায়িইয়াহ : শাইখুল ইসলাম শাসকশ্রেণির সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এই কিতাবে তিনি শাসক ও দায়িত্বশীলদের উপদেশ দিয়েছেন; সেই সাথে শাসকের করণীয় ও বর্জনীয়, অন্যায়-জুলুম, শাস্তি-ব্যবস্থা, প্রজার কর্তব্য এবং শারয়ি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৩. কায়িদাতুন জালিলাহ ফিত তাওয়াসসুলি ওয়াল ওয়াসিলাহ : এই কিতাবে ওসিলা গ্রহণের প্রকার ও তার হুকুম, শাফায়াত ও তার হুকুম এবং দুআ ও দুআর বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৪. আল-কালিমুত তাইয়িব : একজন মুসলিম দৈনন্দিন জীবনে যেসব মাসনুন দুআ পাঠ করে, সেই দুআ ও জিকির সংকলিত হয়েছে এই কিতাবে।

১৫. আল-কাওয়াইদুন নুরানিইয়াহ : শাইখুল ইসলাম এই কিতাবে কিছু ফিকহি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন এবং মূলনীতিগুলোকে ফিকহি বিন্যাসে সাজিয়েছেন।

১৬. সুজুদুত তিলাওয়াতি মাআনিহি ও আহকামুহু : এই কিতাবটিতে তিলাওয়াতে সিজদা-সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০৩১; হাদিসটি সহিহ।

১৭. আত-তুহফাতুল ইরাকিইয়াহ ফিল আমালিল কলবিইয়াহ : শাইখুল ইসলামের এক বন্ধু তার কাছে আত্মিক আমলের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে তিনি এ কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম বলেন, 'এই বইটি আত্মিক আমল নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত কথার সংকলন। আল-আমালুল কলবিইয়াহ বা আত্মিক আমলই মূলত ঈমানের মূলভিত্তি ও দ্বীনের মূলনীতি। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা, আল্লাহর ওপর ভরসা, একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করা, আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন, আল্লাহর হুকুম পালনে ধৈর্যধারণ, আল্লাহর ভয় ও তার রহমতের আশা পোষণ করা ইত্যাদি।'

১৮. আদ-দুরুল মানসুরাহ ফি যিয়ারাতিল কুবুর : কবর জিয়ারতের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই কিতাবে।

১৯. হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ও লিবাসুহা ফিস সালাত : সালাতে নারীদের পোশাক ও পর্দা-সংক্রান্ত মাসআলা আলোচিত হয়েছে এই কিতাবে।

২০. আর-রদ্দু আলা আহলিল কিসরওয়ান আররাফিদাহ (২ খণ্ড)

২১. কিতাবুর রাদ্দি আলাল মানতিকিইয়িন

২২. আল-কালাম আলা ইরাদাতির রাব্বি ও কুদরাতিহি

তার রচনাবলির বৈশিষ্ট্য

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর রচনায় এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল, যা তার কিতাবগুলোকে সেই যুগের সাধারণ রচনাসমূহ থেকে ভিন্ন ও অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত করে তুলেছে। তাই দেখা যায়, কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও তা নতুন প্রজন্মকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। বুদ্ধিবৃত্তিপ্রিয় এবং যুক্তিনির্ভর এই বর্তমান সময়ে এসেও সেগুলো নতুনভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মানুষের মনন ও মস্তিষ্কে গাঢ় ছাপ ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। তার অনন্যসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিচের চারটি গুণ খুব বেশি মাত্রায় উল্লেখযোগ্য—

[এক] ইসলামের শাশ্বত চেতনার নির্ভুল উপলব্ধি ও সমকালীন ভাষায় তা উপস্থাপন। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর রচনা পাঠ করলে, মনের গহীনে এই অনুভূতি জেগে ওঠে, লেখক শরিয়তের প্রকৃতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। ইসলামের কার্যকারণকে কলমের আঁচড়ে স্পষ্ট করে তুলতেন। ইসলামের নানা অনুদ্ঘাটিত দিক ও জীবনঘনিষ্ট জিজ্ঞাসার অজস্র মূলনীতি তিনি পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এজন্য যেকোনো বিষয়েই তার আলোচনা বা সমালোচনা হতো বস্তুনিষ্ঠ এবং পক্ষপাতহীন।

তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিবর্তে উসুল তথা নীতির ওপর বেশি জোর দিতেন। আলোচনার সময় এমন আবহ ও পটভূমি তৈরি করতেন, যে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে, এটাই দ্বীনের মেজাজ ও শাশ্বত চেতনা। এটাই দ্বীনের প্রাণ ও আত্মা। এটাই শরিয়তে মুহাম্মাদির দাবি ও উদ্দেশ্য।

সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্বের গোপন রহস্য এটাই যে তিনি শরিয়তের প্রকৃত স্বরূপ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং তার যোগ্য মুখপাত্র হিসেবে সার্থকভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তার ছোট বড় প্রতিটি রচনাতেই এই অনন্য বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়; বিশেষত যখন তিনি আকাইদ ও ইলমে কালাম-সম্পর্কিত ফিকহি মাসআলার ওপর আলোচনা করেন।

[দুই] জীবন বোধ। ইসলামের আলোয় দাঁড়িয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষায় তাদেরই জীবনের চিত্রায়ণ করা ছিল ইবনু তাইমিয়ার রচনার গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। রচনার ছত্রে ছত্রে তিনি যেন জীবনের ছবি আঁকেন; মানুষের অব্যক্ত যত কথা ও সমস্যা তুলে আনেন এবং তার ইসলামি সমাধান পেশ করেন। তার বই পড়তে গেলে, মনেই হবে না যে, এগুলো কোনো শিক্ষায়তনের নিভৃত কোণে বসে লেখা হয়েছে; বরং মনে হবে এগুলো যেন জীবনের ময়দানে হেঁটে হেঁটে, জনসাধারণের মাঝে বসে, গল্প করতে করতে লেখা হয়েছে।

তার রচিত গ্রন্থাদি পড়ার মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তার যুগে প্রবেশ করা যায়। সেই যুগের সমাজ ও সভ্যতার হালচিত্র, সেসময়কার নীতি-নৈতিকতা ও মানুষের চারিত্রিক অবস্থার পরিমাপ করা যায়। বোঝা যায় লেখকের পছন্দ ও অপছন্দের জায়গা; আবেগ ও প্রেরণার উৎস এবং দুঃখ ও দহনের উপলক্ষ্য। সর্বোপরি এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যে, লেখক মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। ইসলামের দাবি এবং মানুষের নিত্যদিনের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি ফুটে উঠত তার রচনায়।

জীবনের সঙ্গে কুরআনের সম্পর্ক ও যোগসূত্র খুঁজে বের করা ছিল তার কুরআন তাফসিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি আয়াত ও বিধান থেকে তিনি জীবনের জন্য শিক্ষা বের করে আনতেন। চারপাশের জীবন ও সমসাময়িক লোকদের ওপর কীভাবে ঐশী নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে, তা বলে দিতেন। এসব না মানার কারণে মানবজীবনে কী কী বিচ্যুতি ঘটছে আর কত ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসছে, তাও উল্লেখ করতেন।

[তিন] গভীরতা ও সামগ্রিকতা। ইলমের সকল শাখায় তার দখল ছিল অসাধারণ। তিনি যে বিষয়েই কলম ধরতেন, সে বিষয়েই অন্যতম সেরা কাজটি বেরিয়ে আসত

তার কলম থেকে। তার গ্রন্থগুলোতে একসাথে এত দিকের সমন্বয় ঘটত যে, সাধারণ পাঠকের জন্য তা পুরোপুরি ধারণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে যেত। তবে দুরূহ হলেও, তার রচনাসমূহের উপকারিতা অপরিসীম। তার এক একটি কিতাবেই এত সামগ্রিকভাবে আলোচনা এসেছে যে তা অনেক সময় একটি গ্রন্থাগারের মতো কাজ করত। কুরআন, হাদিস, পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক মনীষীদের উক্তি এবং তার নিজস্ব আলোচনা মিলিয়ে কিতাবগুলো যেন পরিণত হতো এক ছোটখাটো বিশ্বকোষে। ফলে কোনো বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে জ্ঞানসন্ধানী ব্যক্তিবর্গ প্রথমেই তার কিতাবাদির দ্বারস্থ হতেন। প্রাচীন আলিমদের মতামত ও চিন্তাসমষ্টিকে তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করে জ্ঞানের বহু দিককে একসাথে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা যুগ যুগ ধরে এক বিশাল অবদান হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

[চার] সাবলীল ভাষা ও সঠিক তথ্যের নিশ্চয়তা। তার বইগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে এসব বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত অপরাপর গ্রন্থের মতো রুক্ষতা ও জটিলতা নেই। বরং তার প্রতিটি রচনার ছত্রে ছত্রে রয়েছে সাহিত্য, ঋজুতা এবং বাগ্মিতার এক অপূর্ব সমাবেশ। আর এই গুণগুলোই তার কিতাবকে আরও আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী ও জীবন্ত করে তুলেছে। বিশেষ করে, তিনি যখন প্রাচীন আলিমদের ইলম, আমল ও চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন তার কলম জোরদার হয়ে উঠত। তার সমসাময়িক সাহিত্যিক ও জীবনীকারগণ তার জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার ভাষার অলংকরণ ও বাগ্মিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

হাফিজ আবু হাফস বলেন, 'তার কথা ছিল উত্তাল সমুদ্রের মতো। কথা বলার সময় তিনি প্রথমে চোখ বন্ধ করতেন, তারপর বক্তৃতা শুরু করতেন। সেসময় তার দিকে তাকালে মনে হতো যেন তিনি সবার মাঝ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন। তার বক্তৃতার ভাষা এতটাই বাঙ্ময় ও সাবলীল হতো যে, গোটা মজলিস আশ্চর্যরকম প্রভাবিত হয়ে পড়ত।'

তার রচিত ও সংগৃহীত কিতাব থেকে মানুষের উপকার গ্রহণ

নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত, শাইখুল ইসলামের কাছে কেউ তার লিখিত কোনো রচনা চাইলে, তিনি কখনো 'না' করতেন না; বরং বলতেন, তোমার ইচ্ছে ও প্রয়োজন মতো যা লাগে নিয়ে নাও।

একদিন এক ভদ্রলোক শাইখুল ইসলামের কাছে একটি কিতাব চাইতে আসেন। শাইখ তাকে পছন্দমতো একটি কিতাব বেছে নেওয়ার অনুমতি দেন। ভদ্রলোক তখন শাইখের কুতুবখানা থেকে কুরআনুল কারিমের একটি মুসহাফ নিয়ে চলে গেল। শাইখ এই মুসহাফটি অনেক মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছিলেন। এ ঘটনা

দেখে উপস্থিত অনেকেই তাকে মৃদু তিরস্কার করল। উত্তরে শাইখ বললেন, একজন মানুষ কিছু চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া কি ভালো দেখায়? থাক না; মুসহাফটি বরং তার কাজেই লাগুক।

তার মালিকানায় থাকা কোনো কিতাব কেউ চাইলে, তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া খুব অপছন্দনীয় ব্যাপার বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, 'ইলম অনুসন্ধানকারীকে ইলম থেকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।'[১]

---

[১] *সিরাতু শাইখিল ইসলাম*, ইসলাম আল-হুসামি, পৃষ্ঠা : ১৪৬-১৪৭

নির্বাচিত বাণী

আল্লাহর নেজাম

আল্লাহর একটি নেজাম এই যে, তিনি যখন হককে বিজয়ী করতে চান, তখন হকের বিরুদ্ধে কাউকে দাঁড় করিয়ে দেন। তারপর তার বাণী দিয়ে হককে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। হকের তরবারি দিয়ে বাতিলকে আঘাত করেন। ফলে বাতিল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।[১]

হৃদয়ের আমল

একনিষ্ঠতা ও ইখলাসই হলো ইসলামের হাকিকত। কারণ ইসলাম মানে একমাত্র আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা। যে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে না, সে অহংকারী। আর যে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করার পাশাপাশি গাইরুল্লাহর সামনেও আত্মসমর্পণ করে, সে শিরকে লিপ্ত হয়।[২]

লজ্জাশীলতা

الحياء (লজ্জাশীলতা) শব্দটি নির্গত হয়েছে الحياة (জীবন) থেকে। জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিই লজ্জাশীল হয়ে থাকেন। যে সমস্ত অশ্লীল কাজ মানুষের হৃদয়কে নষ্ট করে দেয়, একমাত্র জীবন্ত হৃদয়ই মানুষকে সে সমস্ত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।[৩]

---

[১] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ২৮, পৃষ্ঠা : ৫৭

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৪

[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১০৯

আল্লাহর প্রকৃত বান্দা

যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ভিত্তি মনে করে, সে-ই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা। এমন ব্যক্তি নিজের বা দ্বীনের জন্য শুধু সেটাই পছন্দ করে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। আর সেটাই অপছন্দ করে, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। সে আল্লাহর ওলিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আর শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহর শত্রুদের সাথে। এভাবেই সে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে ওঠে। ঠিক যেমনটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, 'যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আর আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; আল্লাহর জন্য দান করে আর আল্লাহর জন্যই দান থেকে বিরত থাকে, সে-ই তার ঈমান পূর্ণ করেছে।'[১][২]

ভালোবাসার নিদর্শন

প্রতিটি মুমিনের হৃদয়েই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। কারও মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র ঈমান থাকে, তবে তার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে এ ভালোবাসার কথা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। বরং কোনো না কোনোভাবে তা প্রকাশ পেয়েই যায়। বিশেষ করে কেউ যখন আল্লাহ বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয় কিংবা তাদের মর্যাদার অনুপযোগী কোনো কথা বলে, তখন সে আর শান্ত থাকতে পারে না। নিজের বাবা-মাকে কেউ গালি দিলে মানুষ যতটা রাগ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে গালি দেওয়া হলে একজন মুমিন তারচেয়েও বহুগুণ বেশি ক্রুদ্ধ হয়।[৩]

হিংসা

হিংসা হলো মনের রোগ। আর এ রোগের প্রকোপ খুব মারাত্মক। খুব কম মানুষই এ রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারে। তাই তো বলা হয়, 'হিংসা থেকে কেউ মুক্ত নয়। তবে ইতর শ্রেণির লোকেরা হিংসা প্রকাশ করে দেয় আর মহান ব্যক্তিরা গোপন রাখে।' হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, 'মুমিন কি কখনো হিংসা করতে পারে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'তুমি কি ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের কথা ভুলে গেছ? যতক্ষণ কথায় কিংবা কাজে হিংসা প্রকাশ না করবে, ততক্ষণ তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। সুতরাং যার মনে অন্যের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হয়, সে যেন আল্লাহভীতি ও ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং হিংসাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে।'[৪]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬৮১; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৭৬১৩; হাদিসটি সহিহ।

[২] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৮-৩৮৯

[৩] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৩৪৩

[৪] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১২৫

অহংকার

অহংকার শিরক থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ মুশরিক লোক তো আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করে, কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১]

তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতা

আখিরাতের জন্য অনুপকারী সবকিছু ত্যাগ করাই দুনিয়াবিমুখতা, আর আখিরাতের জন্য যাতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে তা ত্যাগ করাই তাকওয়া।[২]

ইবাদত

আল্লাহর পছন্দনীয় সমস্ত কথা ও কাজই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, মা-বাবার প্রতি ভালো ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ, প্রতিবেশী, এতিম, দরিদ্র, মুসাফির, দাস সকল শ্রেণির মানুষ ও প্রাণীর প্রতি সদাচার, দুআ, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত; সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া, তার হুকুম পালনে ধৈর্যধারণ ও নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর রহমতের আশা ও আজাব নিয়ে ভয় পোষণ করাও আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

জিকির

দেহের জন্য খাদ্য যেমন, হৃদয়ের জন্য জিকিরও তেমন। দেহ অসুস্থ হলে যেমন খাবারের স্বাদ অনুভব করা যায় না; তেমনই দুনিয়ার ভালোবাসা থাকলে, হৃদয়ও জিকিরের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে না।[৪]

জান্নাত

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে বলতে শুনেছি, দুনিয়াতেই জান্নাত রয়েছে, যে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি,

---

[১] *মাদারিজুস সালিকিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৪

[২] *মাদারিজুস সালিকিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০

[৩] *মাজমুউল ফাতাওয়া,* ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৪

[৪] *মিনহাজুস সুন্নাহ,* ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৯

সে আখিরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।'[১]

একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'শত্রুরা আমার কীই-বা ক্ষতি করবে? আমি তো জান্নাতকে বুকে নিয়ে চলি। কারাগার আমায় দেয় রবের সাথে একাকী সময় কাটানোর সুযোগ। মৃত্যু দেবে শাহাদাতের অমিয় সুধা আর নির্বাসন দেবে এক আনন্দময় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।'[২]

যে নেক আমল জাহান্নামে নিয়ে যায়

বান্দা অনেক সময় নেক আমল করেও জাহান্নামে যায়। আবার কখনো কখনো গুনাহ করেও জান্নাতে প্রবেশ করে। বান্দা যখন নেক আমল করে মুগ্ধ হয়, মানুষের মাঝে অহংকার করে বেড়ায়; তখন এই নেক আমলই তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর সে যখন গুনাহ করার পরে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং বারবার তাওবা করতে থাকে, তখন এই গুনাহই তার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়ে যায়।[৩]

সুন্নাহর গুরুত্ব

ইবনু তাইমিয়া বলেন, জনৈক ব্যক্তি মালিক ইবনু আনাসকে মিকাতের (ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) পূর্বে ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আপনার ওপর ফিতনার আশঙ্কা করছি। লোকটি জানতে চায়, এতে ফিতনার কী আছে! মিকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধলে বরং দীর্ঘ সফর আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করা যাবে। মালিক ইবনু আনাস বলেন, এরচেয়ে বড় ফিতনা আর কী হতে পারে যে, আপনি এমন কাজ করাকে উত্তম মনে করছেন, যা নবিজি করেননি।[৪]

বিদআত ও কবিরা গুনাহ

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সুফিয়ান সাওরি ও অন্য ইমামগণ বলেন, শয়তানের কাছে কবিরা গুনাহের চেয়ে বিদআত অধিক প্রিয়। কারণ কবিরা গুনাহ করে লোকে তাওবা করে, কিন্তু বিদআত থেকে তাওবা করা হয় না।

'বিদআত থেকে তাওবা করা হয় না'—এ কথার অর্থ হলো, বিদআতি ব্যক্তি এমন বিষয়কে দ্বীনি আমল হিসেবে গণ্য করে, যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেননি। এর শাস্তি হিসেবে মন্দ আমলকে তার

---

[১] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃষ্ঠা : ১০৯

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪৫

[৪] *শারহু উমদাতিল ফিকহ*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬৪

জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়। যত দিন সে মন্দ কাজকে ভালো মনে করে, তত দিন তাওবা করতে পারে না। কারণ মানুষ যখন জানতে পারে যে, সে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে কিংবা কোনো উত্তম আমল ত্যাগ করেছে, তখনই সে তাওবা করতে পারে। এ কারণে বলা যায়, খারাপ কাজকে গুনাহ হিসেবে জানাই হলো তাওবার সূচনা।[১]

বিপদাপদ

মুমিনের জীবনে বিপদাপদ ও দুঃখকষ্ট অনেকটা শীত ও গ্রীষ্মের মতো। কেউ যখন বিশ্বাস করে, শীত ও গ্রীষ্ম প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখন সে ঋতুর পরিবর্তনে বিরক্ত হয় না। মুমিনও তেমন বিপদাপদ হলে দুশ্চিন্তা করে না; ব্যথিতও হয় না।[২]

যে ভয় প্রশংসিত

যে ভয় মানুষকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখে, সে ভয় প্রশংসিত।[৩]

হারাম ভালোবাসা

গায়রে মাহরাম নারীর ভালোবাসায় এত বেশি অনিষ্ট রয়েছে, যার পরিমাণ শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন। এই ভালোবাসা প্রথমে প্রেমিকের দ্বীনকে বরবাদ করে, তার বিবেককে নষ্ট করে আর স্বাস্থ্যকে ভেঙে দেয়।[৪]

রিয়া ও অহংকার

إِيَّاكَ نَعْبُدُ (আমরা আপনারই ইবাদত করি) রিয়া দূর করে, আর إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই) দূর করে অহংকার।[৫]

হক ও বাতিল

১. হক হলো খাঁটি সোনার মতো; যত পরীক্ষা করা হয় ততই তার উৎকৃষ্টতা বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে বাতিল হলো নকল সোনার মতো; যত পরীক্ষা করা হয়, তার নিকৃষ্টতা তত প্রকাশ পেতে থাকে।[৬]

---

[১] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৬৩৩

[২] *মাদারিজুস সালিকিন*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬১

[৩] *মাদারিজুস সালিকিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫১৪

[৪] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৩২

[৫] *মাদারিজুস সালিকিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৭

[৬] *আল-জাওয়াব আস-সহিহ*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৮

২. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়তে এমন ক্ষমা, নম্রতা ও উত্তম আচরণের কথা বলা আছে যা ইঞ্জিলে অনুপস্থিত। আবার তার শরিয়তে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এমন দৃঢ়তা, কঠোরতা ও জিহাদের কথা বলা হয়েছে, যা তাওরাতে অনুপস্থিত। এটি মূলত মুহাম্মাদি শরিয়তের পূর্ণতারই প্রতীক। এজন্যই অনেকে বলেন, মুসা আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল প্রতাপ দিয়ে, ঈসা আলাইহিস সালামকে সৌন্দর্য দিয়ে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে পূর্ণতা দিয়ে।[১]

বন্দিত্ব

বন্দি তো সে, যার হৃদয় তার রব থেকে বিমুখ হয়ে আছে। বন্দি তো সে, যে তার প্রবৃত্তির জালে আটকা পড়েছে।[২]

কর্মকৌশল

যে ব্যক্তি স্রষ্টার কাছে কল্যাণ কামনার পাশাপাশি সৃষ্টির সাথে পরামর্শ করে, তার কখনো কোনো কাজ নিয়ে আফসোস করতে হবে না।[৩]

সবর ও ইয়াকিন

সবর ও ইয়াকিনের মাধ্যমেই দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জিত হয়।[৪]

নিয়ত

উত্তম নিয়ত করলে সাধারণ কাজগুলোও নেক আমলে পরিণত হয়।[৫]

ভ্রাতৃত্ব

কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলেই যদি একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে ত্যাগ করে, তবে মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বলে কিছু থাকবে না।[৬]

---

[১] *আল-জাওয়াব আস-সহিহ*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৬

[২] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃষ্ঠা : ১০৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১১২

[৪] *মাদারিজুস সালিকিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৩

[৫] *আল-ঈমান*, ইবনু তাইমিয়া, পৃষ্ঠা : ৩৮

[৬] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ১৭৩

নেক আমল ও ইস্তিগফার

একবার শাইখুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোনটি বান্দার জন্য বেশি উপকারী; তাসবিহ না ইস্তিগফার?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'কোনো কাপড় যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে তার জন্য গোলাপজল ও সুগন্ধি বেশি উপকারী। আর যদি কাপড় হয় নোংরা-অপরিচ্ছন্ন; তাহলে তার জন্য সাবান ও গরম পানি বেশি উপকারী। তাসবিহ হলো পবিত্রদের সুগন্ধি; আর ইস্তিগফার হলো গুনাহগারদের সাবান।'[১]

ঈমান

ঈমান ব্যতীত দুনিয়ার আর কোনো নিয়ামতই আখিরাতের নিয়ামতের সমান নয়।[২]

বিবেক ও আসমানি কিতাব

একমাত্র আল্লাহর কিতাবই মানুষের মধ্যকার বিবাদ দূর করতে পারে। বিবাদ দূর করতে মানুষ যদি বিবেকের দ্বারস্থ হয়, তাহলে বিবেক তো সবারই আছে।[৩]

হৃদয়ের কঠোরতা

কঠোরতা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কঠিন অন্তরকে নরম করতে পারে কেবল আল্লাহর জিকির। সুতরাং বান্দার উচিত আল্লাহর জিকির দিয়ে হৃদয়ের কঠোরতার চিকিৎসা করা।[৪]

সমর্পণ

যে ব্যক্তি তার হৃদয়কে রবের কাছে সোপর্দ করে, সে প্রশান্তি লাভ করে। আর যে তার হৃদয়কে মানুষের মায়ায় জড়িয়ে ফেলে, তার দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আল্লাহর প্রিয়জন

আল্লাহ তাআলা তার প্রিয়জনদের চেনার দুটি নিদর্শন রেখেছেন; সুন্নাহর অনুসরণ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।[৫]

---

[১] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃষ্ঠা : ২৩৩

[২] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ২৮, পৃষ্ঠা : ৩১

[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৬৩

[৪] *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃষ্ঠা : ৭১

[৫] উবুদিইয়াহ, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৪

ন্যায়পরায়ণতা

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যদিও তা কাফির রাষ্ট্র হয়। পক্ষান্তরে কোনো রাষ্ট্রে যদি জুলুম ছেয়ে যায়, তবে তা মুসলিম রাষ্ট্র হলেও তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন না।[১]

শাসকের ভয়

শাইখ কামালুদ্দিন ইবনু আনজা বলেন, শাইখ ইবনু তাইমিয়া বলতেন, 'মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় পায় শুধু অন্তরের রোগের কারণে।' ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে এক ব্যক্তি বলেছিল, 'আমি শাসকদের ভয় পাই।' তিনি বলেছিলেন, 'তুমি সুস্থ হয়ে গেলে আর কাউকে ভয় পাবে না।'[২]

---

[১] *মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া*, খণ্ড : ২৮, পৃষ্ঠা : ৬৩

[২] *আল-আলামুল আলিইয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৭৪